Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

মে ২০২১ ■ বৈশাখ- জ্যৈষ্ঠ ১৪২৮

নবারুণ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

স্বপ্ন দেখার দিন পহেলা মে

উষার দুয়ারে হানি আঘাত

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

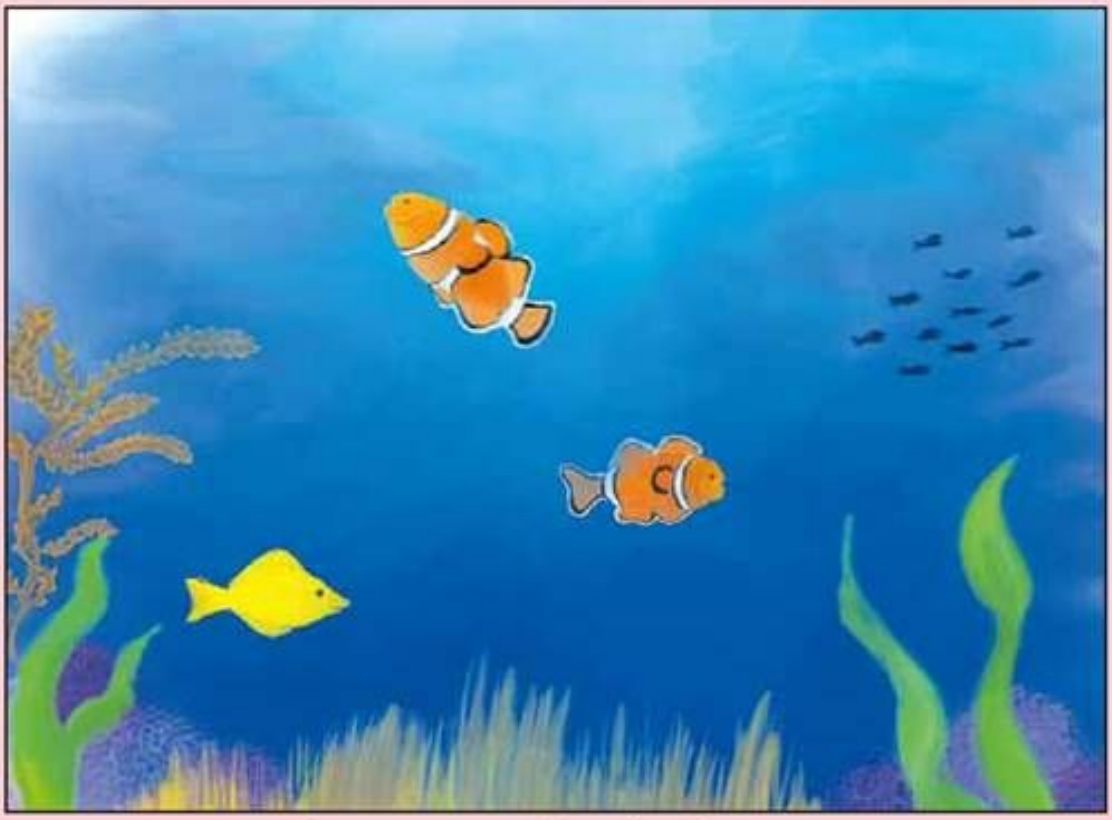

নাজিবা সায়েম, ৯ম শ্রেণি, মাস্টারমাইন্ড স্কুল, ঢাকা

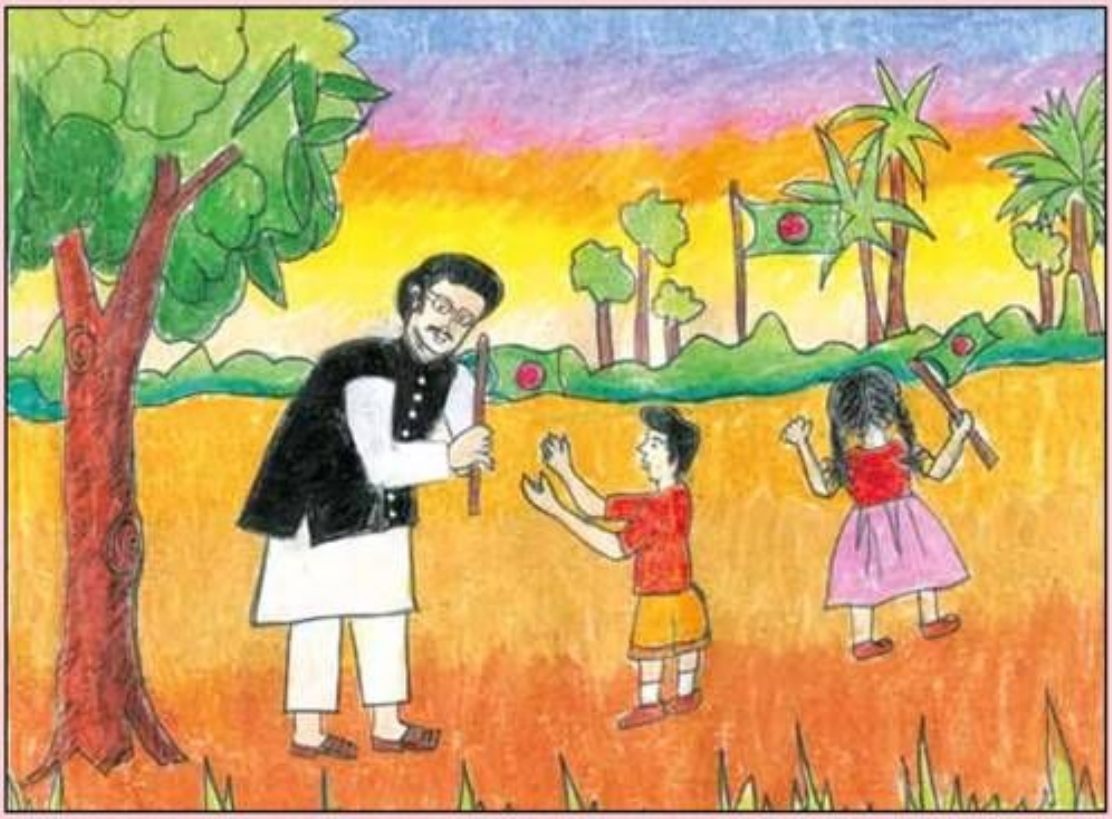

সাইবা হোসেন পুণ্য, ২য় শ্রেণি, সামসুল হক খান স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

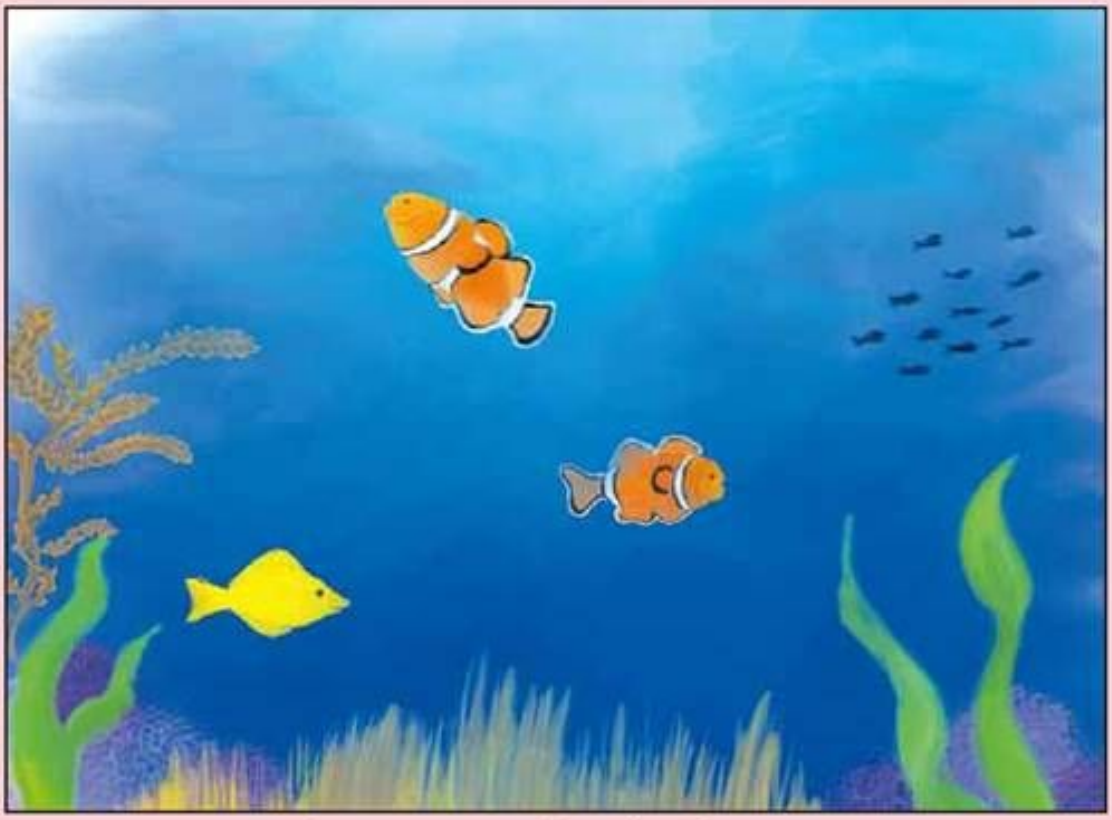

নাজিবা সায়েম, ৯ম শ্রেণি, মাস্টারমাইন্ড স্কুল, ঢাকা

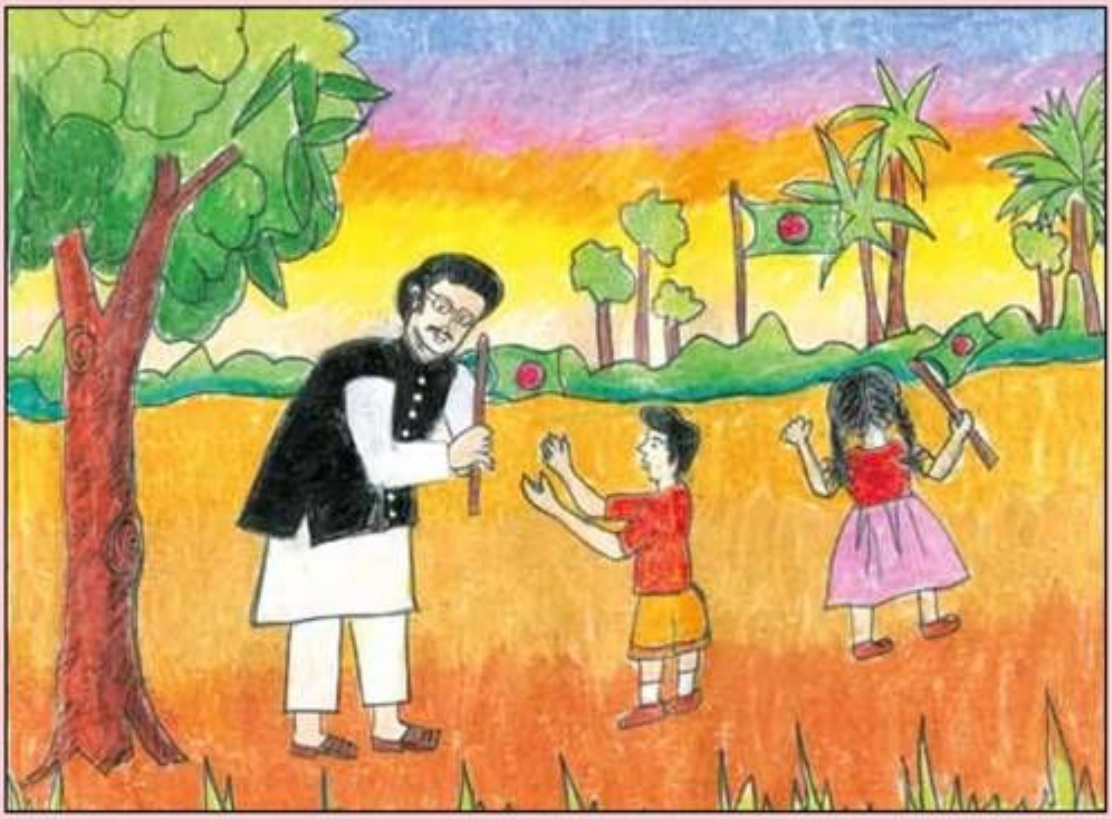

সাইবা হোসেন পুণ্য, ২য় শ্রেণি, সামসুল হক খান স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

প্রধান সম্পাদক
স. ম. গোলাম কিবরিয়া

সম্পাদক
নুসরাত জাহান

সিনিয়র সম্পাদক
হাছিনা আক্তার

সহ-সম্পাদক
শাহানা আফরোজ
মো. জামাল উদ্দিন
তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

সহযোগী শিল্পনির্দেশক
সুবর্ণা শীল

অলংকরণ
নাহ্‌রীন সুলতানা

সম্পাদকীয় সহযোগী
মেজবাউল হক
সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি
মো. মাছুদ আলম

যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৩০০৬৮৮
E-mail : editornobarun@dfp.gov.bd
ওয়েবসাইট: www.dfp.gov.bd

বিক্রয় ও বিতরণ
সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৩০০৬৯৯

মূল্য : ২০.০০ টাকা

মুদ্রণ : প্রিয়াংকা প্রিন্টিং অ্যান্ড পাবলিকেশন্স, ৭৬/ই নয়া পল্টন, ঢাকা-১০০০

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

সম্পাদকীয়

বন্ধুরা, ১লা মে বিশ্বব্যাপী পালিত হয় মহান মে দিবস। ১৮৮৬ সালের এই দিনে শিকাগোর হে মার্কেটে শ্রমিকরা তাঁদের আত্মত্যাগের মধ্যদিয়ে শ্রমিক শ্রেণির অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছিল। এবারের মে দিবসের প্রতিপাদ্য- 'মালিক-শ্রমিক নির্বিশেষ মুজিববর্ষে গড়ব দেশ'।

বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা শেখ হাসিনা আমাদের প্রিয় প্রধানমন্ত্রী। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট ঘাতকরা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করে। এসময় বিদেশে থাকায় ঘাতকদের হাত থেকে বেঁচে যান বঙ্গবন্ধুর দুই কন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা। দীর্ঘ ৬ বছর নির্বাসনে থাকার পর ১৯৮১ সালের ১৭ই মে প্রিয় মাতৃভূমিতে প্রত্যাবর্তন করেন শেখ হাসিনা। তাই মে মাসের ১৭ তারিখ আমাদের জাতীয় জীবনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

বন্ধুরা, এখনো করোনা ভাইরাসের মারাত্মক হুমকিতে আছে বাংলাদেশসহ পুরো বিশ্ব। সাবধানে থাকবে আর ঘরের বাইরে যাবে না। জরুরি প্রয়োজনে বাইরে গেলে অবশ্যই মাস্ক ব্যবহার করবে। কঠোরভাবে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলবে।

আমাদের প্রিয় কবি রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন ৭ই মে । আবার জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মদিন মে মাসের ২৪ তারিখ। আমরা প্রিয় দুই কবিকে স্মরণ করি আন্তরিক শ্রদ্ধার সাথে।

৮ই মে বিশ্ব মা দিবস। মা পৃথিবীর সবচেয়ে আপন ও প্রাণের একটি শব্দ। বন্ধুরা, মাকে ভালোবাসতে কোনো বিশেষ দিবসের প্রয়োজন নেই। মা দিবসকে মনে রেখে মাকে ভালোবাসো প্রতিক্ষণ, প্রতিদিন হয়ে উঠুক মা দিবস।

ভালো থেকো বন্ধুরা। তোমাদের জন্য রইল অনেক অনেক শুভেচ্ছা।

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

নিবন্ধ

০৪ স্বপ্ন দেখার দিন পহেলা মে/ইমরুল ইউসুফ
০৮ উষার দুয়ারে হানি আঘাত/মনি হায়দার
১৩ ছোটোদের বিশ্বকবি/মির্জা মোহাম্মদ নূরন্নবী নূর
১৫ আমাদের জাতীয় কবি/নুসরাত জাহান
২১ কবি নজরুলের গাড়ী/মো. সিরাজুল ইসলাম
২৪ আমার মা/আরিফুল ইসলাম
৪৪ বজ্রপাতে ভয় নয়, হবো সচেতন/তৈয়বুর রহমান
৫৪ ডিমের পাহাড়/ইফতেখার আলম
৫৬ মিনি সুন্দরবন/শাহান আফরোজ
৬০ ব্ল্যাক ফাঙ্গাস: আতঙ্ক নয়, সচেতন হবো/মো. জামাল উদ্দিন

গল্প

১৮ ঈদ-বোনাস/রফিকুর রশীদ
৩৪ রতনপুরের বিচ্ছুবাহিনী/মুস্তাফা মাসুদ
৩৭ ঝুড়ি পাকা আম/সারমিন ইসলাম রত্না
৩৯ ভাষা দাদুর সঙ্গে ঋ এবং অন্যান্য যুক্তবর্ণ/তারিক মনজুর
৪২ ভালো কিছু করার অসুখ/বিশ্বজিৎ দাস

সায়েন্স ফিকশন

২৮ রিটার্ন টু লাইফ/আশরাফ প্রিন্টু

ভ্রমণ কাহিনি

৪৯ ঘুরে এলাম আগরতলা/তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

সাফল্য প্রতিবেদন

৫৮ বিশ্বের দামি আম বাংলাদেশে/রামিন আলম
৫৯ হলুদ পদ্ম এখন গোমতী/মেজবাউল হক
৬২ প্রথমবারে বাংলাদেশের সেরা অর্জন/জান্নাতে রোজী
৬৩ দশদিগন্ত/সাদিয়া ইফফাত আঁখি

বড়োদের কবিতা

০৭ শ্রমিক তারা/মো. তোফাজ্জল হোসেন
০৭ শ্রমিকের মর্যাদা/সুজিত হালদার
১১ তুমি ফিরে এসেছিলে তাই/নিজামউদ্দীন মুন্সী
১৭ আগুন পিতা/প্রত্যয় জসীম
১৭ মুজিব চিরন্তন/মো. মুহিবুল্লাহ
২৭ আকাশ ছুয়ে দেখি/ফারুক হাসান
২৭ মাস্ক/আ.ফ.ম. মোদাচ্ছের আলী

ছোটোদের ছড়া

২৬ মা আমার/তামিম হোসেন
২৬ প্রিয় মা/সায়মা আক্তার
২৭ আমাদের গ্রাম/তাসনিম সুহিনা
৩৮ আম/মো. মিহির হোসেন

ছোটোদের গল্প

৪৭ মা দিবসের গল্প/ মারজুক রাসেল
৫৩ সাপ, বেজি ও ব্যাঙ/ওয়াহিদ মুস্তাফা

ছোটোদের আঁকা

দ্বিতীয় প্রচ্ছদ: নাজিবা সায়েম/সাইবা হোসেন পুণ্য
শেষ প্রচ্ছদ: হোমায়েদ নাসের

১২ দৃপ্ত ওয়ালিদ
২৩ রাফান ইবনে মেহেদী
৩৮ সায়মা আনজুম বিভা
৪১ নাওশিন শারমিলি নাফসিন
৪৩ ফাতিমা তাহনান
৪৬ মো. আব্দুল্লাহ
৪৮ ফামিন আজিজ
৫৫ আদ্রিতা খানম নিথর
৫৭ তাসদিদ তাবাসুম আসফিয়া
৬১ সানজিনা সিদ্দীকি ওকি
৬৪ ফারদিন শামস জামান/ফারহা হোসেন

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

নিবন্ধ

স্বপ্ন দেখার দিন পহেলা মে

ইমরুল ইউসুফ

পুকুরের পানিতে ভাসছে শত শত মরা মাছ। রুই, কাতলা, মৃগেল, কার্ফু, পুঁটি আরও কত্ত মাছ। ভাসছে পাতার মতো! দু তিনদিন পর আজ একটু আগে রোদ উঠেছে। রুপালি মাছের গায়ে রোদ লেগে পুকুরের চারপাশটা যেন আরো রুপালি হয়ে উঠেছে। ইয়াসের তাণ্ডবে নদীর বাঁধ ভেঙেছে। লোনা পানি ঢুকেছে এলাকায়। পানির সে-কি স্রোত। মুহূর্তেই ভাসিয়ে নিয়ে গেল ঘরবাড়ি, পুকুর, বাজার-ঘাট।

মিষ্টি পানির মাছ লবণ পানিতে বাঁচে না। এজন্য রুই, কাতলাসহ পুকুরের হরেক মাছ মরলো। ভেসে গেল অনেক মাছ। পানিতে ভেসে থাকা এ মাছ এখন ডাঙায় তুলতে হবে। এলাকার শিশু কিশোরদের খবর দেওয়া হলো। বলা হলো মাছগুলো ডাঙায় তুলতে। মাটি খুঁড়ে মাছগুলো পুঁতে ফেলতে। এ কাজের বিনিময়ে একেকজন পাবে একশ টাকা। এলাকার চেয়ারম্যান এলাকা পরিদর্শন করতে গিয়ে দেখলেন একদল শিশু পুকুর থেকে মাছ তুলছে। আরেক দল শিশু মাটি কাটছে। কোনো কোনো শিশু ভেঙে পড়া পাঁচিলের ইট মাথায় করে সরাচ্ছে। এ দৃশ্য দেখে চেয়ারম্যান রেগেমেগে বললেন, 'কে শিশুদের এ কাজে লাগিয়েছে? সে কাজটি মোটেও ঠিক করেনি। কারণ শিশুদের দিয়ে এসব কাজ করানো ঠিক নয়। শিশুদের দিয়ে মাটি কাটা, ইট বহনের মতো ভারী কাজ করালে সেটি শিশুশ্রমের মধ্যে পড়ে। বড়ো মানুষগুলোও কি বানের জলে ভেসে গেছে, যে শিশুরা এ কাজ করছে?' চেয়ারম্যানের বকাবকিতে শিশুদের কাজ বন্ধ হলো।

আহা কী আনন্দ আকাশে বাতাসে। আজ ক্লাস নেই। মোবাইল খুলে অনলাইন ক্লাসের জন্য বইপত্র নিয়ে বসতে হবে না। হোমওয়ার্ক করতে হবে না। আজ গল্পের বই পড়ে সময় কাটানোর দিন। করোনার কারণে স্কুল তো সেই কবে থেকে বন্ধ। আজ

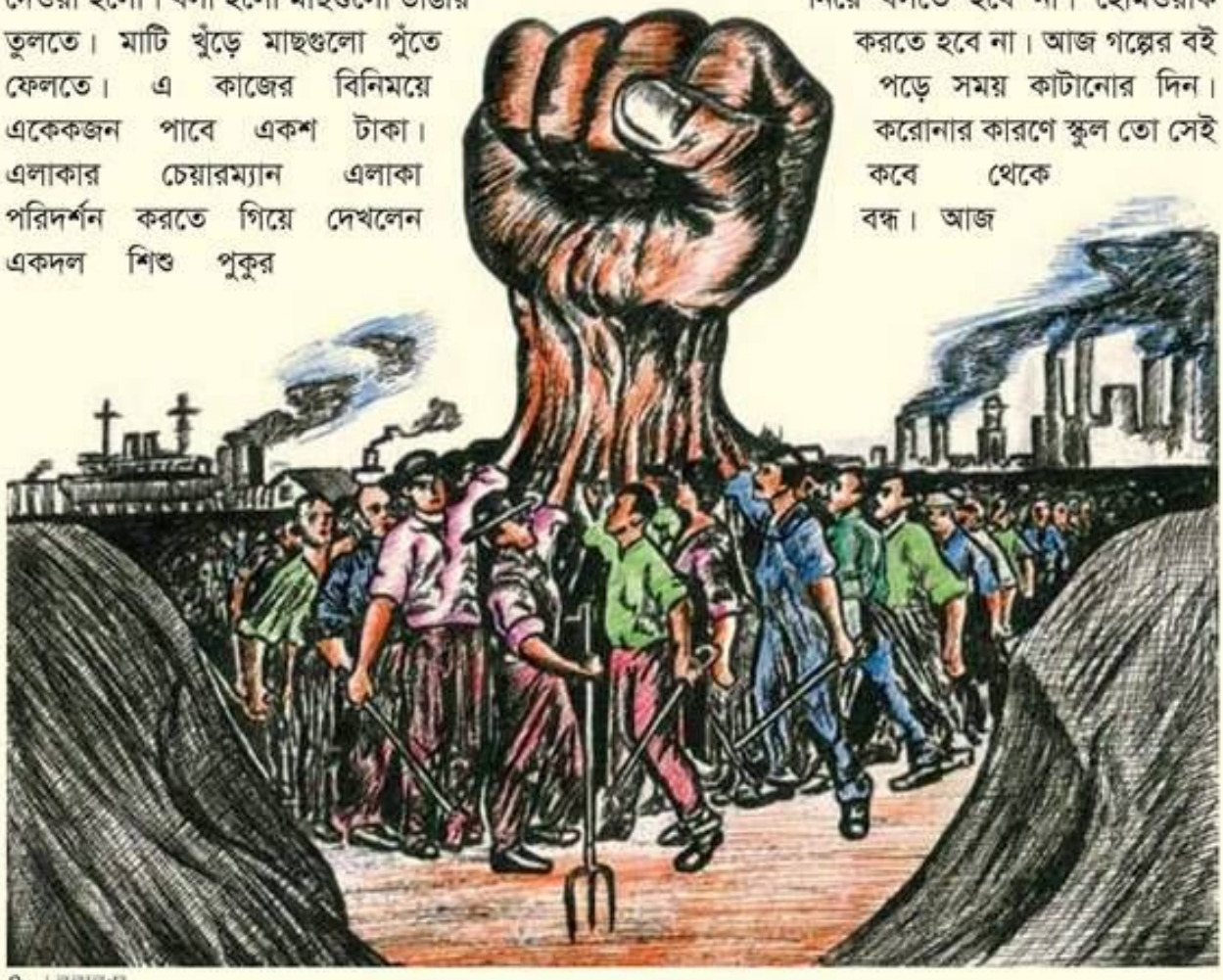

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

কলকারখানাও বন্ধ। আজ গাড়ির চাকা ঘুরবে না। কারখানার কলের চাকা ঘুরবে না। শ্রমিকরা বাড়িতে বসে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে আনন্দে সময় কাটাবে। স্বাস্থ্যবিধি মেনে বেড়াতে বের হবে। কারণ আজ পহেলা মে। মহান মে দিবস। বঞ্চিত খেটে খাওয়া শ্রমজীবী মানুষদের অধিকার আদায়ের দিন। শ্রমিকের অধিকার প্রতিষ্ঠার দিন। ইতিহাসে আজকের এদিন ১৩৬ বছর পেরুল।

তোমরা বইয়ে পড়েছ সভ্যতার রূপায়ণ ঘটেছে শ্রমিকের হাতুড়ির আঘাতে আঘাতে। শ্রম দিয়েই দুনিয়ার অগ্রযাত্রা। শ্রমেই সৃষ্টি। অথচ শ্রমিক তার অধিকার হারা সভ্যতার শুরু থেকেই। ইটের ওপর ইট গেঁথে আকাশ ছোঁয়া বাড়ি বানিয়েছে। নাট, বোল্টু, ছেনি, কাচি ব্যবহার করে জাহাজ বানিয়েছে। বিমান বানিয়েছে। পাহাড় কেটে সুড়ঙ্গ বানিয়েছে। পানির নিচ দিয়ে টানেল বানিয়েছে। আরো কত কী যে করেছে লিখে শেষ করা যাবে না। কিন্তু শ্রমিকরা বরাবরই তার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে। শোষণ বঞ্চনার শিকার হয়েছে।

হাজার বছরের বঞ্চনা আর শোষণ থেকে মুক্তি পেতে ১৮৮৬ সালের পহেলা মে বুকের রক্ত ঝরিয়েছিলেন শ্রমিকরা। শ্রম ঘণ্টা কমিয়ে আনার দাবিতে এদিন তারা যুক্তরাষ্ট্রের সব কারখানায় ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিলেন। কারণ তখন কারখানার মালিকরা শ্রমিকদের দিয়ে ১৮-২০ ঘণ্টা পর্যন্ত কাজ করিয়ে নিতেন। এজন্য ধর্মঘটের ডাকে সাড়া দিয়ে শিকাগো শহরের তিন লক্ষাধিক শ্রমিক কাজ বন্ধ রাখেন। শ্রমিক সমাবেশ ঘিরে শিকাগো শহরের হে মার্কেট রূপ নেয় লাখো শ্রমিকের বিক্ষোভ সমুদ্রে। লাখ লাখ শ্রমিকের সঙ্গে আরো অসংখ্য বিক্ষুব্ধ শ্রমিক লাল পতাকা হাতে সমবেত হন সেখানে। বিক্ষোভ চলাকালে পুলিশ শ্রমিকদের ওপর নির্বিচারে গুলি চালায়। এতে প্রাণ হারান দশজন শ্রমিক। গ্রেফতার করা হয় ১৬ জনকে। পরের বছর অর্থাৎ ১৮৮৭ সালের ২১ শে জুন তাদের বিচার শুরু হয়। ৯ অক্টোবর ঘোষিত হয় বিচারের রায়। তাতে ছয় জন শ্রমিককে ফাঁসি দেওয়া হয়। তিন জনকে দেওয়া হয় যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। এর ফল হয় আরো ভয়াবহ। পুরো বিশ্বের শ্রমিকরাই এবার ঐক্যবদ্ধ হতে থাকে। শিকাগোর এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে বিশ্বব্যাপী। বিশ্বের সকল শ্রমিক শামিল হয় ওই আন্দোলনে। এই দুর্বার আন্দোলনের সামনে অবশেষে হার মানতে বাধ্য হন কল-কারখানার মালিকরা। ১৮৮৯ সালে ফ্রান্সের প্যারিসে অনুষ্ঠিত হয় আন্তর্জাতিক শ্রম সংগঠনের একটি সম্মেলন। এ সম্মেলনে শ্রমিকদের দৈনিক কাজের সময় ৮ ঘণ্টা ও সপ্তাহে ১ দিন ছুটির বিধি রেখে তৈরি হয় প্রথম শ্রম আইন।

১৮৮৯ সালের ১৪ই জুলাই আন্তর্জাতিক কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হলো। সিদ্ধান্ত হলো পহেলা মে শিকাগোর আন্দোলনে প্রাণ দেওয়া শ্রমিকদের স্মরণে মে দিবস পালিত হবে। পরের বছরে ১৮৯০ সালের পহেলা মে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ ইউরোপের কয়েকটি দেশে প্রথম মে দিবস পালিত হয়। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে আমাদের দেশে পহেলা মে মে দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। রক্ত দিয়ে কেনা শ্রমিকের অধিকার প্রতিষ্ঠার এ দিনটি বাংলাদেশেও যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হয়। ব্রিটিশ আমলে ১৯৩৮ সালে ঢাকার নারায়ণগঞ্জে প্রথম মে দিবস পালিত হয়। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশে প্রথম বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে পালিত হয় মে দিবস। ওই বছর থেকে পহেলা মে সরকারি ছুটি ঘোষিত হয়। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো আমাদের দেশেও এ বছর যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান মে দিবস পালিত হয়। এ বছর মে দিবসের প্রতিপাদ্য ছিল 'মালিক শ্রমিক নির্বিশেষ/মুজিববর্ষে গড়ব দেশ।'

দিবসটি উপলক্ষ্যে মাননীয় রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী শ্রমজীবী মানুষসহ দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানান। সরকারি- বেসরকারি অফিস-আদালতের পাশাপাশি ব্যাংক, বীমা করপোরেশন, কলকারখানা বন্ধ থাকে। রেডিও, টেলিভিশন বিশেষ অনুষ্ঠানমালা প্রচার এবং সংবাদপত্রগুলো বিশেষ ক্রোড়পত্র ও নিবন্ধ-প্রবন্ধ প্রকাশ করে। শ্রমিক সংগঠনগুলোর পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন ও নানা কর্মসূচি পালন করে।

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

কাজই মহান। কাজই শক্তি। কাজই উন্নতি। কাজই সমৃদ্ধি। বিশ্বের এগিয়ে চলার প্রাণশক্তিই হচ্ছে কর্মশক্তি। বাংলাদেশ আজ যে দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলেছে তার পেছনে ১৬ কোটি জনশক্তির একটি বড়ো শক্তি কাজ করছে। আজ সব জায়গায় বেড়েছে কাজের পরিধি। ফলে এ জাতি শ্রম এবং পরিশ্রমে মোটেও পিছিয়ে নেই। 'কঠোর শ্রম' কথাটি নিয়ে থমাস জেফারসন বলেছিলেন 'আমি ভাগ্যে বিশ্বাসী নিঃসন্দেহে, তবে আমি এটাই দেখি– কাজটি যত কঠিন করি, ফলটি ততই ভালো পাই।' সুতরাং পড়াশোনা বলি আর অন্য যে-কোনো কাজ বলি আমরা পরিশ্রম, আন্তরিকতা এবং ভালোবাসা দিয়ে করব। তাহলেই আমাদের উন্নতি হবে। সমৃদ্ধি আসবে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শ্রমজীবী মানুষকে মহান করে দেখতেন। তিনি বলতেন 'আমরা যারা শিক্ষিত, আমরা যারা বুদ্ধিমান, ওষুধের মধ্যে ভেজাল দিয়ে বিষাক্ত করে মানুষকে খাওয়াই তারাই। নিশ্চয়ই গ্রামের লোক এসব পারে না, নিশ্চয়ই আমার কৃষক ভাইরা পারে না। নিশ্চয়ই আমার শ্রমিক ভাইরা পারে না।' তিনি আরো বলেছেন, 'আপনি চাকরি করেন, আপনার মায়না দেয় ওই গরিব কৃষক। আপনার মায়না দেয় ওই জমির শ্রমিক। আপনার সংসার চলে ওই টাকায়। আমি গাড়িতে চলি ওই টাকায়। ওদের সম্মান করে কথা বলেন, ওদের ইজ্জত করে কথা বলেন। ওরাই মালিক।' আর আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম তো কুলি-মজুরসহ খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষের কথা লিখে গেছেন সারাজীবন। তিনি লিখেছেন–

'তোমারে সেবিতে হইল যাহারা মজুর, মুটে ও কুলি
তোমারে বহিতে যারা পবিত্র অঙ্গে লাগাইল ধূলি
তারাই মানুষ, তারাই দেবতা, গাহি তাহাদের গান
তাদেরই ব্যথিত বক্ষে পা ফেলে আসে নব উত্থান'।

মানুষ শ্রম দেবে তার নিজের প্রয়োজনে। কিন্তু এজন্য তাকে দিতে হবে ন্যায্য মজুরি। যথার্থ বিশ্রাম ও বিনোদনের সুযোগ। কেউ যদি কোনো শ্রমিককে ৮ ঘণ্টার বেশি কাজ করায় তবে তাকে অতিরিক্ত টাকা দিতে হবে। যাকে আমরা ইংরেজিতে বলি ওভারটাইম। পৃথিবীর সব দেশের শ্রমবাজারে নির্দিষ্ট সময়ের বাইরে অতিরিক্ত কাজ করার জন্য বেতনের অতিরিক্ত টাকা দেওয়ার বিধান রয়েছে। কলকারখানার মালিকরা যদি এ নিয়ম না মানেন, শ্রমিকদের যদি বঞ্চিত করেন তাহলে এ দিবস পালন করে কী লাভ। কারণ শ্রমিকরা এমনিতেই বেতন কম পান। অতিরিক্ত কাজ করে পাওয়া বাড়তি অর্থ দিয়ে তারা সংসারের খরচ চালান। সন্তানের লেখাপড়ার খরচ মেটান। সাধ আহলাদ পূরণের চেষ্টা করেন। এজন্য শ্রমিকদের ন্যায্য প্রাপ্য দিতে হবে। তাদের কাজের দক্ষতা বাড়াতে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। তাহলে উৎপাদন বাড়বে। উৎপাদন বাড়লে দেশে সমৃদ্ধি আসবে। আর সমৃদ্ধি মানেই ধীরে ধীরে স্বপ্ন পূরণের দিকে এগিয়ে যাওয়া। শ্রমিকের অধিকার পূরণ হলেই মে দিবস তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠবে।

তোমরা এখন যারা এ লেখা পড়ছ তারা তো আর সারাজীবন ছোটো থাকবে না। লেখাপড়া শিখে একদিন অনেক বড়ো হবে। কেউ কেউ হয়ত বড়ো বড়ো কলকারখানার মালিক হবে। ব্যাংক কিংবা বিমা কোম্পানির মালিক হবে। গার্মেন্টসের মালিক হবে। তখন তোমরা শ্রমিককে নিয়মিত বেতন দেওয়ার চেষ্টা করবে। তাদের স্বার্থ, তাদের স্বাস্থ্য, তাদের কল্যাণ, তাদের মানবিক বিষয়গুলো দেখবে। আট ঘণ্টা কাজের বাইরে ওভারটাইম করলে তাদের ওভারটাইমের টাকা দেবে। তাহলে তাদের জীবনমানের উন্নয়ন ঘটবে। শ্রমিক হবেন উৎপাদনশীল। মালিক-শ্রমিকের সুসম্পর্কে প্রতিষ্ঠান হবে কর্মমুখর, আনন্দময়। তাই মে দিবস হোক শ্রমিকের শোষণ বঞ্চনার অবসান ঘটার দিন। শিশুশ্রম বন্ধ হওয়ার দিন। নতুন করে স্বপ্ন দেখার দিন। উৎপাদনশীল খাতে বাংলাদেশের অগ্রযাত্রার দিন।■

লেখক: সহকারী পরিচালক, বাংলা একাডেমি

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

শ্রমিক তারা

মো. তোফাজ্জল হোসেন

কঠোর শ্রম দিয়ে যারা
ঝরায় মাথার ঘাম
তাদের জানাই হৃদয় থেকে
হাজারো শ্রদ্ধা ও সালাম।
ঘাম শুকানোর আগেই যদি
দেই তাদের মজুরি গুণে
তাদের মুখে ফুটবে হাসি
যাবে অনেক সওয়াব মিলে।
তারা যখন থাকবে ভালো
ঘুরবে দেশের চাকা
দেশের জন্য তাদের অবদান
পড়ে না যেন ঢাকা।

শ্রমিকের মর্যাদা

সুজিত হালদার

শিল্প সে তো
শ্রমিকের ঘামে অর্জিত তোমাদের সম্পদ
অজস্র বিপ্লবী হাতে গড়ে দিই রাজপ্রাসাদ
অজস্র মেহনতী মানুষের রক্ত জলের ইতিহাসে।

শ্রমজীবী সে তো
ক্ষুধার রাজ্যে শ্রমের বিকিকিনি
খেটে-খাওয়া মানুষের পরিশ্রমের সাধারণ মূল্য
ভাত ও ভাতের অধিকার আদায়ের লড়াই।

অধিকার সে তো
চাই বঞ্চিত মজুরের ন্যায্য পারিশ্রমিক দাও
সময়ের বেঁধে দেওয়া শ্রম কর্মপরিকল্পনা
আর আমাদের জানমালের হেফাজত করো
আমরা তোমাদের নিয়ে করব ঈশ্বরের বড়াই।

ইটের ভাটায়,কল-কারখানার চাকায় পিষ্ট জীবন
অকালে ঝরে যেতে যেতে
তোমাদের পৃষ্ঠপোষকতা চায়,মানবিকতা চায়
ভালোবাসো সৃষ্টির মতো স্রষ্টার হাতকে
প্রভুত্ববাদ নয় মনুষ্য বাদের মন-মানসিকতায়।

আজ এই ক্রান্তিলগ্নে
মানুষের অসহায়ত্ব হাহাকার করে ফিরে
মুছে দাও শ্রমিকের পেটের পোড়া
নিঃশর্ত মানবিকতার অহিংস মানবতার হাতে।

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

নিবন্ধ

উষার দুয়ারে হানি আঘাত

মনি হায়দার

অন্ধকারের পরই আসে আলো।

আলো আসে দরজা দিয়ে, আলো আসে জানালা দিয়ে, আলো আসে আকাশ দিয়ে। আলোয় আলোয় ভরে যায় চারদিক, আর মনের কালোও। বাংলাদেশে অনেকবার কালো অন্ধকার এসে আমাদের সকল দরজা, আমাদের সকল জানালা, আমাদের সকল আকাশ অন্ধকার করে দিয়েছিল। কিন্তু মানুষের ইতিহাস প্রমাণ করেছে, অন্ধকারের পরই আসে আলো, গভীর আলো, ঝলমলে আলো, সুন্দরের আলো।

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

১৯৮১ সালের ১৭ই মে আমাদের জন্য আলোর দিন, দ্বীপশিখা জ্বলবার ও জ্বালাবার দিন। সেদিন আকাশ খুব কেঁদেছিল, বৃষ্টি নেমেছিল ঢাকায়, সারা বাংলাদেশে, গ্রামেগঞ্জে আর টুঙ্গিপাড়ায়ও। কারণ, বাংলাদেশটা বিগত কয়েক বছর শোকে স্তব্ধ হয়েছিল। সকল আলোর সড়ক অন্ধকারের অশুভ শক্তিরা ঢেকে রেখেছিল। সেই অশুভ শক্তি ও অন্ধকারের বিরুদ্ধে আলোর মশাল হাতে জনতার কাতারে, কুর্মিটোলা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিমান থেকে নেমেছিলেন মহানেত্রী শেখ হাসিনা। মহানেত্রীর ফিরে আসার আগে আমাদের ফিরে যেতে হবে একটা বিষাক্ত কালো ভোরের কাছে। ১৯৭৫ সালের পনেরোই আগস্ট, ভোর। শ্রাবণের দিন। সেদিনের সকালটায় গোটা বাংলাদেশ শোকের মাতমের আর রক্তপাতের স্রোতে ভেসে গিয়েছিল। ধানমন্ডির বত্রিশ নম্বর বাড়িটির সিঁড়ি বেয়ে রক্তের স্রোতোধারা মিশেছিল নদীনালা, খালবিল পার হয়ে, বঙ্গোপসাগরে। কারণ, সেই রক্ত ছিল পিতার, বাঙালির হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করেছিল সেনাবাহিনীর বখে যাওয়া একটি অংশ মিলে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আজীবন দেশটাকে ভালোবেসে লড়াই করেছেন, জেল খেটেছেন, ফাঁসির মঞ্চে গেছেন, সেই অমৃত পুত্রকে হত্যার পর বাংলার আকাশ আর মাটি কি না কেঁদে পারে? সেদিনও কেঁদেছিল বাংলার আকাশ ও মাটি- বাঙালির শোকে, জাতির পিতাকে হারানোর যন্ত্রণায়...।

বত্রিশ নম্বরের বাড়িতে ঘাতকেরা হত্যা করেছে– বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব, শেখ কামাল, শেখ জামাল, সুলতানা কামাল খুকু, পারভীন জামাল রোজী, শেখ রাসেল, শেখ আবু নাসের, আবদুর রব সেরনিয়াবাত, শেখ ফজলুল হক মনি, বেগম আরজু মনি, কর্নেল জামিলউদ্দিন আহমেদ, বেবী সেরনিয়াবাত, আরিফ সেরনিয়াবাত, সুকান্ত আবদুল্লাহ বাবু, শহীদ সেরনিয়াবাত ও আবদুল নইম খান রিন্টু। এত জীবন নাশ ও রক্তপাতের মধ্যে বেঁচেছিলেন দুইজন– বঙ্গবন্ধুর দুই কন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা।

শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধুর বড়ো সন্তান। জন্ম নিয়েই দেখেছেন রাজনীতিবিদ পিতা দেশ ও জাতির জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেছেন। বাড়িতে যতটা না থাকেন, তার চেয়ে অনেক বেশি থেকেছেন রাজনীতির মাঠে, জনতার সঙ্গে– মিছিলে, জনসভায় আর পাকিস্তান সরকারের কারাগারে। কতদিন তিনি পিতার জন্য খাবার নিয়ে মায়ের সঙ্গে গেছেন কারাগারের ফটকে। দেখেছেন পিতা মুজিব আর নিজের পিতা নেই, তিনি হয়ে গেছেন বাঙালি জাতির রাজনৈতিক পিতা। জন্মদাতা পিতাকে জেলের শিকের মধ্যে দিয়ে একটু ছুঁয়ে দেখেছেন, চেষ্টা করেছেন পিতার শরীরের ঘ্রাণ নিতে। জীবনের তীব্র পরিভ্রমণে শেখ হাসিনা দেখেছেন পিতার রাজনীতির মায়া। দেখেছেন মায়ের ধরিত্রী রূপ। সেই মায়া ও মমতার মিশেলে তিনি গড়ে উঠেছেন, বেড়ে উঠেছেন।

কিন্ত ইতিহাসে আমরা প্রমাণ পাই, রাজনীতির জীবন বড়ো পিচ্ছিল। বড়ো বেদনার। অনেক বড়ো ষড়যন্ত্রের। ১৯৭৫ সালের পনেরোই আগস্ট শ্রাবণের ভোরে ঘাতকের হাতে নিহত হলেন পিতা, আর ভাগ্যের অলৌকিক ভালোবাসায়, দেশে না থাকায় বেঁচে গেলেন দুই কন্যা- শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা।

পিতা নিহত হলেন, স্মৃতি আর বেদনার পাথর নিয়ে প্রবাসে, সুদূর জার্মানে বসে শুনলেন মর্মান্তিক মৃত্যুর মিছিল। শোকে স্তব্ধ দুই বোন। সেই সময়ের জার্মান দূতাবাসের কর্মকর্তারাও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন। কিন্তু মুক্তিযোদ্ধা হুমায়ূন রশীদ চৌধুরীর কুশলায় শেখ হাসিনা ও শেখ রেহেনা আশ্রয় পেলেন ভারতে, শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর মহানুভবতায়। নিজ দেশ থেকে, স্বাধীন জন্মভূমি থেকে প্রতিবেশী ভারতের দিল্লিতে রইলেন অন্তরালে। থাকছেন অন্তরালে কিন্তু বুকের মধ্যে হু হু অশ্রুপাতে ডাকছে বাংলাদেশ। বাংলাদেশের বত্রিশ নম্বরের সাদামাটা বাড়িটি।

যে বাড়িটি মাত্র কয়েক বছর আগেও ছিল জাগরুক, ছিল মানুষের পদভারে চলমান, সেই বাড়িটি শোকে স্তব্ধ হয়ে অপেক্ষা করছে, শেখ হাসিনার পদধ্বনির।

অন্যদিকে বাংলাদেশের সেই সময়ের রাজনীতিতে চলছে স্বাধীনতা বিরোধিতাকারীদের দৌরাত্ম্য।

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

ক্ষমতায় সামরিক বাহিনী। যদিও দেশে একটা নির্বাচন হয়েছে কিন্তু ক্ষমতার বলয় স্বাধীনতার চেতনা থেকে ছিটকে গেছে বহুদূরে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে আওয়ামী লীগে চলছে নানা মেরুকরণ। সেই মেরুকরণ আর স্বাধীনতার অমৃতধারা জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য, মহানেত্রী শেখ হাসিনা দেশে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নিলেন। দেশে আসার সিদ্ধান্ত নেওয়া অনেক কঠিন ছিল। কিন্তু বঙ্গবন্ধু কন্যা মহানেত্রী পিতার কাছে শেখা সাহসের মহামন্ত্র বুকে নিয়ে জন্মভূমি বাংলাদেশে ফিরে আসেন ১৯৮১ সালের ১৭ই মে।

বঙ্গবন্ধুর কন্যা শেখ হাসিনা দেশে ফিরবেন খবরে বাংলার মানুষ আনন্দে উল্লাসে মেতে উঠেছিল। পরিবারের সদস্যদেরসহ হত্যা করেছে, তুমি শক্তি দাও, সেইসব খুনিদের বিচার যেন মুজিবের বাংলায় করতে পারি...। পরম আনন্দ ও বিস্ময়, মহান সৃষ্টিকর্তা মহানেত্রীর সেই আবেদন কবুল করেছেন। এবং রাজনীতির সকল অপপ্রচার, ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ১৯৯৬ সালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ জনগণের ভোটে রাষ্ট্র পরিচালনার সুযোগ পায় এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি পাকিস্তানের রাজনীতির স্রোত থেকে বাংলাদেশকে ফিরিয়ে আনেন, মুক্তিযুদ্ধের স্রোতে। তিনি দেশের ও বিদেশের সকল ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে দিয়ে দৃঢ় সাহসের সঙ্গে জাতির পিতার হত্যার বিচার শুরু করেন। যখন বিচার শুরুর সিদ্ধান্ত নেন তখন তিনি

কারণ, দেশের সাধারণ মানুষ শেখ হাসিনার মধ্যে জাতির পিতার রাজনীতির ও সাহসের প্রতিচ্ছবি দেখেছিল। বাংলার জনগণ ভেবেছে, নেত্রীর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ পুনর্গঠিত হবে, বাংলাদেশের স্বাধীনতার আদর্শ পুনরায় ফিরে আসবে। তিনি মানুষের আশা ও আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হয়ে সেই শ্রাবণের দিনে জনতার মাঝে ফিরে এলেন জনতার নেত্রী।

বিমানবন্দরে নেমে তিনি দুহাত মহান স্রষ্টার কাছে তুলে প্রার্থনায় বলেছিলেন, হে পরম সৃষ্টিকর্তা! আপনি আমাকে এই দেশের নিপীড়িত জনতার সেবা করার সুযোগ দিন। জাতির পিতাকে যারা নির্মমভাবে সকল ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করে পিতা হত্যার বিচারের ব্যবস্থা করেছেন। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর বাঙালি জাতি কলঙ্কমুক্ত হয়েছে মহানেত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ ও সাহসী নেতৃত্বের মহৎ গুণে। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে মহান স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হলে অনেকে স্বাধীনতার বিরোধিতা করেছিল। হত্যা করেছিল অনেক মুক্তিযোদ্ধা, নারী, পুরুষ ও শিশুদের। সেইসব যুদ্ধের যারা অপরাধী, তিনি সেই অপরাধীদেরও বিচারের ব্যবস্থা করেন। নতুন আইন পাস করেন এবং বিচারের মাধ্যমে অপরাধীদের শাস্তির শেষ সীমায় পৌঁছে দেন।

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

বাংলার স্বাধীনতার ইতিহাস চিরকাল বাংলার প্রধানমন্ত্রী, মহানেত্রী শেখ হাসিনার বন্দনা গাইবে, আর বলবে- 'জয় বাংলা, বাংলার জয়..' প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের আর্থ- সামাজিক অগ্রগতি অসামান্য। বাংলাদেশ এখন অনুন্নত দেশের কাতার ছেড়ে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে। বাংলাদেশের অর্থনীতি এখন খুবই শক্তিশালী। বিশেষ করে চাল, মাছ ও চা উৎপাদনে বাংলাদেশ পৃথিবীর অনেক দেশকে ছাড়িয়ে গেছে। গার্মেন্টস সামগ্রী রপ্তানি করে বাংলাদেশ পৃথিবীতে সুনাম কুড়াচ্ছে। প্রতিবেশী দেশ ভারত ও মায়ানমারের কাছ থেকে বিশাল সমুদ্রসীমা করায়ত্ত করেছে বাংলাদেশ। এখন আমাদের বিশাল সমুদ্রসীমা। সেই সীমার মধ্যে বিভিন্ন খনিজ দ্রব্য মাছ পাওয়া যাচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রীর বলিষ্ঠ নেতৃত্বের কারণে, গত দুই বছরের করোনাকালেও বাংলাদেশের অগ্রগতি অবিশ্বাস্য। করোনার নির্মম আক্রমণে বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ যখন বিপন্ন, মানুষ অসহায়- সেই দুঃসহকালেও বাংলাদেশের অগ্রগতি এগিয়ে চলেছে। আজকে বাংলাদেশের যে অগ্রগতি, অর্জন এবং দুনিয়া জুড়ে যে সম্মান– সবই মহান নেত্রীর হাতের ছোঁয়ায়...। বলা যায় তিনি আমাদের পরশপাথর। যা স্পর্শ করেন, পরম সোনায় পরিণত হয়।

তিনি আমাদের কাণ্ডারি। তিনি বাঙালি জাতিসত্তার প্রতীক। তিনি মুক্তিযুদ্ধের চেতনার আলোকঘর। তিনি বঙ্গবন্ধুর আদর্শের প্রতিলিপি। তাঁকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশ ঘুরছে, হাসছে এবং সৃষ্টির উল্লাসে নৃত্য করছে। আরো একটা ঘটনা মহাননেত্রীর নেতৃত্বে ঘটেছে বাংলাদেশে, যা বিশ্বে অভাবনীয়, অসাধারণ আর বিস্ময়কর- সেটা কোটি কোটি বই কোটি কোটি ছাত্রদের কাছে বিনামূল্যে পৌঁছে দেওয়া। এমন ঘটনা পৃথিবীর কোনো দেশে নেই। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মানে-সাফল্য- উন্নয়ন- অগ্রগতি-নতুন বইয়ের টাটকা ঘ্রাণ–সমুদ্র বিজয়- মেট্রোরেল–পদ্মা সেতু।

যা কিছু হচ্ছে, মূলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সেই-১৯৮১ সালের ১৭ই মে। যেদিন তিনি ফিরে এসেছিলেন প্রিয়তম পিতার স্বাধীন মাটিতে বৃষ্টিমুখর সময়ে। প্রার্থনা রেখেছিলেন পরম সৃষ্টির কাছে– আমাকে শক্তি দাও, আমাকে

তুমি ফিরে এসেছিলে তাই

নিজামউদ্দীন মুন্সী

বড়ো কষ্টের মাঝে একদিন
কেটেছে বাঙালির কাল
সেই দুর্দিনে কাণ্ডারি হয়ে
ধরেছিলে তুমি হাল।
তুমি এলে আর ফিরে এল যেন
সুদিনের সকাল
পালটে ফেললে বাংলার অভাবের
চিরচেনা হাল।
মিটালে তুমি খাদ্য-বস্ত্রের অভাব
বিশ্ববাসী অবাক বিস্ময়ে দিলো জবাব-
তোমার হাতেই নিরাপদ বাংলাদেশ
তোমাতেই অর্পিল শ্রদ্ধা অনিঃশেষ।
তুমি ফিরে এসেছিলে বলে
গণতন্ত্র আজ আর কাঁদে না
বাংলার ভাগ্যাকাশে ধ্রুবতারা তুমি
জননেত্রী শেখ হাসিনা।
উনিশশো একাশি থেকে
দুই হাজার একুশ সাল
শক্ত হাতে ধরে রেখেছ
আমাদের নৌকার হাল।
সৌভাগ্যবশত তোমায় পেয়েছি ফিরে
উন্নয়ন অগ্রগতি সবই তোমাকে ঘিরে
আমাদের গর্ব তোমার সততা
শ্রদ্ধা জানাই নত শিরে।
তোমার হাত ধরেই আমরা
এগিয়ে যেতে চাই
তোমার ফিরে আসার দিনে
প্রতিজ্ঞা মোদের তাই।

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

সাহস দাও, আমি যেন পিতার অসমাপ্ত কাজ শেষ করতে পারি। আমরা পিছনে ফিরে তাকালে, এবং বর্তমানের পরিস্থিতি যোগ করলে, চোখের সামনে দেখতে পাই– জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা কন্যার হাতে প্রবলভাবে বাস্তবায়িত হতে চলেছে– বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে গান লিখেছিলেন– আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি...।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আর শেখ হাসিনা– একই ধারার দুটি মহান বৃক্ষ। আমরা বাঙালি জাতি সেই দুই বৃক্ষের নিচে ছায়া সুনিবিড়ে আশ্রয়ে আছি পরম মমতায়। এবং আমরা কখনো ভুলে যাব না, ১৯৮১ সালের ১৭ই মে দিনটিকে। সেই দিনের শ্রাবণের ধারার সঙ্গে মিশে গেছে বাংলার লাল, বাংলার সবুজ, বাংলার নদী, বাংলার ভাটিয়ালি, বাংলার স্বপ্ন, বাংলার জয়, বাংলা বাংলার, মাটি বাংলার জল...।

সকল অন্ধকারের সময়ে উষার দুয়ারে আঘাত হেনে আলোর দরজা খুলব আর ১৯৮১ সালের ১৭ই মে'র নামতা গাইব। ■

লেখক: ঔপন্যাসিক, গল্পকার ও শিশুসাহিত্যিক

দৃপ্ত ওয়ালিদ, দ্বিতীয় শ্রেণি, ন্যাশনাল ব্যাংক পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

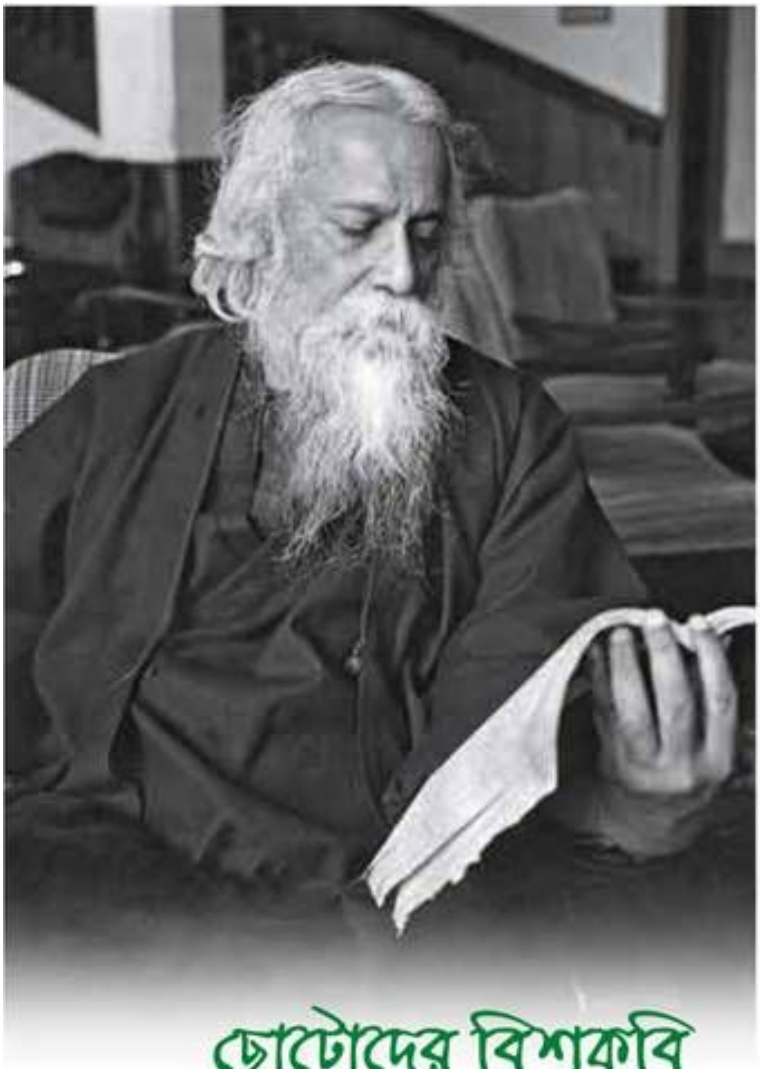

নিবন্ধ

ছোটোদের বিশ্বকবি

মির্জা মুহাম্মদ নূরুন্নবী নূর

সাহিত্যে নোবেল বিজয়ী বিশ্বকবি খ্যাত কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (৭ই মে ১৮৬১ মোতাবেক ২৫শে বৈশাখ ১২৬৮ এবং ৭ই আগস্ট ১৯৪১, মোতাবেক ২২শে শ্রাবণ ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ) কলকাতার এক ধনাঢ্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পারিবারিকভাবে তিনি সংস্কৃতিবান ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান ছিলেন। কবি বাল্যকালে প্রথাগত বিদ্যালয়ে যাননি। গৃহশিক্ষকের তত্ত্বাবধানে বাড়িতেই শিক্ষা লাভ করেছেন। আট বছর বয়সে তিনি কবিতা লেখা শুরু করেন। ১৮৭৪ সালে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় তাঁর প্রথম 'অভিলাষ' কবিতাটি প্রকাশিত হয়। কবি বড়োদের পাশাপাশি ছোটোদের জন্যও প্রচুর লিখেছেন।

বিশ্বকবি শিশুদের নিয়ে অনেক ভেবেছেন। নিজের শিশুসত্তার অতীত থেকে উপাদান আহরণ করেছেন তিনি। কবি ছোটোদের আলোর সন্ধান দিতে চেয়েছেন। আলোর নাচনের দোলায় নাচতে পথ দেখিয়েছেন। এই আলো দিয়েই ভালো সমাজ গঠনে অনুপ্রাণিত করেছেন ছোটোদের। আলোর বানে-প্রাণে বুনতে বলেছেন সত্যের বীজ। কবির ভাষায়-

আলো আমার, আলো ওগো, আলো ভুবন-ভরা,
আলো নয়ন ধোওয়া আমার, আলো হৃদয়-হরা।

মল্লিকা মালতীর মতো শিশুরা আলোর ঢেউয়ে নেচে নেচে চলে তাই তো তিনি লিখেছেন-

আলোর স্রোতে পাল তুলেছে হাজার প্রজাপতি
আলোর ঢেউয়ে উঠল নেচে মল্লিকা মালতী।
(আলো আমার আলো)

কবি শিশুদেরকে সোনা আর মানিক ভেবেছেন। যা গুণে গুণে শেষ করা যায় না। এরা ধরার পাতায় পাতায় রাশি রাশি হাসির পুলক ছড়ায়। নদীতে এরা বয়ে চলে কুলকুল ছন্দে আর সুধা ঝরায়। কবির স্বপ্ন বলে কথা! কবির স্বপ্ন সত্যি হোক সেই কামনাই করি।

কবি শিশুদের মনের আকুতি বুঝতেন। ভাবতেন ছোটোদের ইচ্ছামতীর কথা। তাই তো কবি শিশুদের সূর্য- নদীর সাথে খেলার স্বপ্ন এঁকেছিলেন ছড়া-কবিতায়-

যখন যেমন মনে করি
তাই হতে পাই যদি
আমি তবে এক্ষনি হই
ইচ্ছামতী নদী। (ইচ্ছামতী)

কবি শিশুদের দিন ও রাতের সাথে কথা বলার আকুতি খুঁজে পান কবিতার পরতে পরতে ছড়ার ছন্দ মালায়, ছড়ার ডালিতে। কবির ভাষায়—

আমি কইব মনের কথা
দুই পারেরই সাথে
আধেক কথা দিনের বেলায়
আধেক কথা রাতে। (ইচ্ছামতী)

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

দেশের মাটি ও মানুষকে নিয়ে কবির ভাবনা ছিল সুদূরপ্রসারী। জন্মভূমিকে মায়ের সাথে তুলনা করে কবি লিখেছেন–

সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে
সার্থক জনম, মা গো, তোমায় ভালোবেসে।
(সার্থক জনম আমার)।

কবি তাঁর দেশের ধন সম্পদকে রানির মতো করে ভেবেছেন। এ দেশের গাছের ছায়ায় এসে কবির অঙ্গ জুড়াত। কবির ভাষায়–

জানি নে তোর ধনরতন আছে কি না রানীর মতন,
শুধু জানি আমার অঙ্গ জুড়ায় তোমার ছায়ায় এসে।
(সার্থক জনম আমার)।

এদেশের স্বাধীনতা অনেকের কাছেই ভালো লাগে না। 'যে দেশে জন্ম সে দেশ নিয়েই শত্রুতা- কবি সেটা মেনে নিতে পারেননি। কবি বলেছেন–

কেঁচো কয়, নিচ মাটি, কালো তার রূপ।
কবি তারে রাগ করে বলে চুপ চুপ!

কবি দেশদ্রোহীদেরকে ঘৃণা করতে বলেছেন।

তুমি যে মাটির কীট, খাও তারি রস,
মাটির নিন্দায় বাড়ে তোমার কি যশ!
(স্বদেশদ্বেষী)

সময় মানুষের জীবনে এক অমূল্য সম্পদ। সময় জ্ঞান নাই যাদের তারা জীবনে সফল হতে পারে না। হাস্যচ্ছলে কবিতায় ছোটোদের সচেতন করেছেন এভাবে–

যত ঘণ্টা, যত মিনিট, সব আছে যত
শেষ যদি হয় চিরকালের মতো,
তখন স্কুলে নেই বা গেলেম: কেউ যদি কয় মন্দ,
আমি বলব, দশটা বাজাই বন্ধ (সময়হারা)

জীবন চলার পথে বিপদ আসবে এটা স্বাভাবিক। তাই বলে কী ভেঙে পড়বে শিশুরা? কবি প্রার্থনা করেছেন-

বিপদে মোরে রক্ষা করো
এ নহে মোর প্রার্থণা,
বিপদে আমি না যেন করি ভয়
দুঃখতাপে ব্যথিত চিতে
নাই-বা দিলে সান্ত্বনা
দুঃখে যেন করিতে পারি জয়।
(আত্মত্রাণ)

এটাকে কবি মেনে নিতে অনুপ্রাণিত করেছেন। কবির ভাষায়-

এই করেছ ভালো, নিঠুর,
এই করেছ ভালো।
এমনি করে হৃদয়ে মোর
তীব্র দহন জ্বালো।
(এই করেছ ভালো)

অনাগত শিশুদেরকে বটবৃক্ষের মতো করেই গড়ে ওঠার ইঙ্গিত দিয়েছেন কবি। বীরের বেশে ওরাই ফুল ফুটাবে জনতার মাঝে। তাই কবি কল্পনা করে লিখেছেন–

হাতে লাঠি মাথায় ঝাঁকড়া চুল,
কানে তাদের গোঁজা জবার ফুল।
আমি বলি, 'দাঁড়া খবরদার'
এক পা কাছে আসিস যদি আর-
এই চেয়ে দেখ আমার তলোয়ার
টুকরো করে দেব তোদের সেরে।
শুনে তারা রাফ দিয়ে ওঠে
চেঁচিয়ে উঠল, 'হা রে রে রে রে রে। (বীর পুরুষ)

ছোটোদের এগিয়ে আসতে হবে সত্যের আহ্বানে। সততার জয়গানে গেয়ে উঠতে হবে বিজয়ের গান। জাতি গঠনে আবারো শিশুরা এগিয়ে আসুক নিজস্ব প্রতিভায়। ওদের প্রচেষ্টায় শান্তির নিবাস হোক আমাদের এই ঝঞ্জা-বিক্ষুব্ধ বসুন্ধরা।■

লেখক: প্রাবন্ধিক

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

নিবন্ধ

আমাদের জাতীয় কবি

নুসরাত জাহান

কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিদ্রোহী কবি হিসেবেই বেশি পরিচিত। কিন্তু বাংলাদেশের তিনি জাতীয় কবি। আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্ন সাধ তাঁর রচনায় ফুটে উঠেছে। তিনি বাঙালির কবি,বাংলা সাহিত্যের অমর কবি।

কবি কাজী নজরুল ইসলাম ২৪শে মে ১৮৯৯ বাংলা ১৩০৬ বঙ্গাব্দের ১১ই জ্যৈষ্ঠ ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার আসানসোলের চুরুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা ছিলেন কাজী ফকির আহমদ, মা জাহেদা খাতুন। বাবা ফকির আহমদ স্থানীয় মসজিদের ঈমাম এবং মাজারের খাদেম ছিলেন। দরিদ্র মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করা নজরুলের প্রাথমিক শিক্ষা ছিল ধর্মভিত্তিক।

শৈশবেই নজরুল পিতৃহারা হন। দুঃখ-কষ্টে কাটে তাঁর শৈশব- কৈশোর। এ সময় তিনি সিয়ারসোল হাই স্কুল, মাথরুন নবীনচন্দ্র হাই স্কুল, বাংলাদেশের ময়মনসিংহের ত্রিশাল উপজেলার দরিরামপুর হাই স্কুলে পড়াশুনা করেন। এরই ফাঁকে আসানসোলে রুটির দোকান ও রেলওয়ের গার্ড সাহেবের চাকরি করেন। এই চাকরিও বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। এরপর তাঁকে চাকরি নিতে হয় আসানসোলের একটি রুটির দোকানে। যার মাসিক বেতন ১ টাকা ও আহার। কৈশোরে কাজী নজরুল ইসলাম পড়াশুনার ফাঁকে লেটুর দলে যোগ দেন। লেটুর দলের লোকেরা যাত্রাপালা ও নৃত্য পরিবেশন করত গ্রামে গ্রামে। অভিনয় ও নৃত্যগীতি পরিবেশন করে তারা মানুষের মন জয় করত। এমন একটি দলে কিশোর নজরুল যোগ দিয়ে অভিনয় করেন এবং অনেকগুলো গান সংবলিত যাত্রাপালা রচনা করেন।

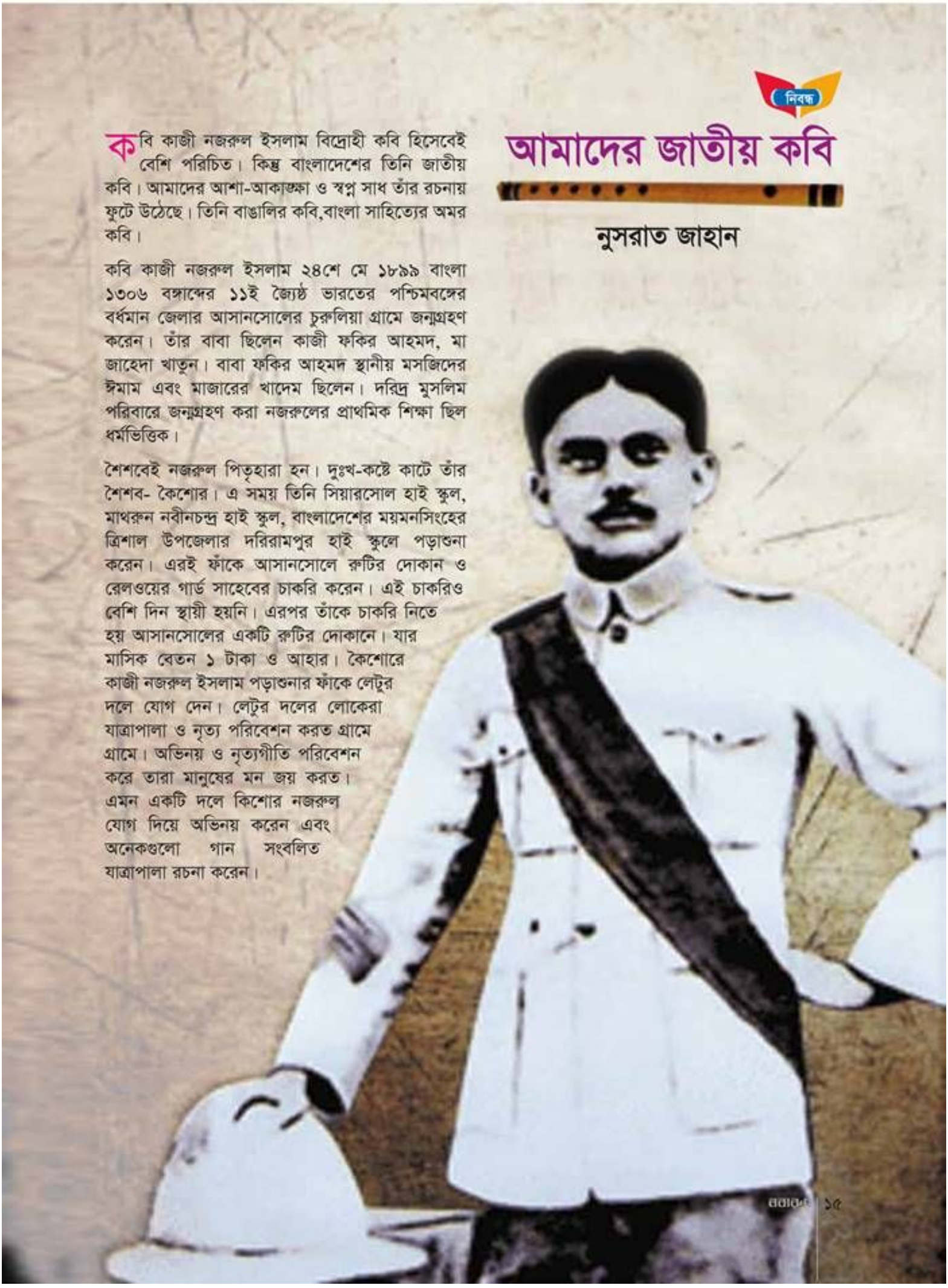

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

তিনি দশম শ্রেণিতে পড়াশুনা করার সময় সেই ১৯১৭ সালে ১ম বিশ্বযুদ্ধে ভারতীয় ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে সৈনিকের দায়িত্ব পালন করেন। তিন বছর পর তিনি সেনাবাহিনীর কাজ শেষ করে ফিরে আসেন কলকাতায়। তখন তিনি কিশোর উত্তীর্ণ এক তরুণ। এর পরই শুরু হয় নিরন্তর সাহিত্যচর্চা। বিদ্রোহের মানসপুত্র তিনি। সমাজের অনিয়ম, অনাচার, দুর্নীতি, ধর্মের বাড়াবাড়ি, স্বাধীনতাহীনতা এবং সমাজের অসাম্যের বিরুদ্ধে মসিযুদ্ধ করেছেন তিনি। তাই তাঁর প্রথম পরিচয় তিনি বিদ্রোহী কবি। আর এই বিদ্রোহ করেছিলেন তিনি বাংলার সাধারণ জনগোষ্ঠীর জন্য। কবি কাজী নজরুল ইসলাম শিশুদের জন্যও লিখেছেন অনেক। বাংলা সাহিত্যের শিশুতোষ শাখাটি তাঁর জাদুকরী হাতের ছোঁয়ায় পূর্ণ হয়েছে।

বাস্তব জীবনে নজরুল ছিলেন এক সংগ্রামী ও আপোশহীন মানুষ। তাঁর ৭৭ বছরের পুরো জীবন। নির্বাক ছিলেন ৩৫ বছর। সমাজ ও মানুষের উঁচুনিচু ভেদাভেদ তাঁকে ভীষণভাবে দংশিত করেছে।

কবি কাজী নজরুল ইসলাম সব ধর্মের মধ্যে ভেদাভেদ ভুলে মানবতার জয়গান গেয়েছেন। তাঁর একটি বিখ্যাত কবিতার লাইন ছিল—

মানুষের চেয়ে বড়ো কিছু নাই,
নহে কিছু মহীয়ান।

দাসত্বের শৃঙ্খলে বদ্ধ জাতিকে শোষণ ও উৎপীড়ন থেকে মুক্ত হবার ডাক দিয়ে তিনি লিখেছিলেন—

'বল বীর বল উন্নত মম শির
বিদ্রোহী রণ ক্লান্ত,
আমি সেই দিন হব শান্ত'।

তিনি সাংবাদিকতাকে পেশা হিসেবে বেছে নেন। এ সময় তিনি ব্রিটিশ ও ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অবতীর্ণ হন। প্রকাশ করেন 'বিদ্রোহী' এবং 'ভাঙার গান'-এর মতো কবিতা ও 'ধূমকেতুর' মতো সাময়িকী। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে তাঁর ভূমিকার জন্য বহুবার কারাবন্দি হয়েছিলেন তিনি। জেলে বন্দি অবস্থায় লিখেছিলেন 'রাজবন্দির জবানবন্দী'। তাঁর এসব সাহিত্যকর্মে সমাজবাদের বিরোধিতা ছিল প্রকট। নজরুল ছিলেন সব ধর্মীয় চেতনার উর্ধ্বে। সর্বোপরি তিনি ছিলেন মানবতার কবি।

নজরুলের প্রতিভার অন্যতম দিক ছিল তাঁর বিদ্রোহী চেতনার বহিঃপ্রকাশ। সমাজ, ধর্ম, রাজনীতি সবকিছুর বিরুদ্ধেই বিদ্রোহে তিনি সোচ্চার ছিলেন। তিনি শুধুমাত্র কবিই ছিলেন না। তিনি ছিলেন গীতিকার, সুরকার, গল্পকার, সাংবাদিক এবং রাজনৈতিক কর্মী। নজরুল ছিলেন অসাম্প্রদায়িক । তাঁর সেই স্বপ্নের স্বাধীন রাষ্ট্র আজকের স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে নজরুলের সাহস জাগানিয়া গান ও কবিতাগুলো আমাদের দামাল মুক্তিকামী বাঙালিকে দেশপ্রেম তথা স্বাধীনতা যুদ্ধে প্রেরণা যুগিয়েছে। তিনিই তো বলেছিলেন— 'জয় বাংলার জয়'। তাঁর সাহিত্যকর্মে প্রাধান্য পেয়েছে মানুষের প্রতি অসীম ভালোবাসা আর মানুষের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা। সাম্যবাদী চিন্তা চেতনা কাজী নজরুল ইসলামকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। একটি নতুন পৃথিবীর স্বপ্ন দেখেছিলেন তিনি।

তিনি গল্প, উপন্যাস এবং নাটকও রচনা করেছেন। বাংলা ভাষায় একটি নতুন প্রাণ নতুন তারুণ্য নিয়ে এসেছেন। নজরুল প্রায় ৩০০০ গান রচনা করেছেন এবং অধিকাংশ গানে নিজেই সুরারোপ করেছেন। যেগুলো এখন 'নজরুল গীতি' নামে জনপ্রিয়। গজল, রাগ প্রধান কাব্য গীতি, উদ্দীপক গান, শ্যামা সংগীত, ইসলামি গানসহ বহু বিচিত্র ধরনের গান তিনি রচনা করেছেন।

মধ্য বয়সে এক দুরারোগ্য রোগে কবি বাকশক্তি হারিয়ে ফেলেন। ১৯৪২ সালের শেষের দিকে তিনি মানসিক ভারসাম্যও হারিয়ে ফেলেন। ১৯৭২ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁকে জাতীয় কবির মর্যাদা দিয়ে ভারত থেকে বাংলাদেশে নিয়ে আসেন। ১৯৭৬ সালের ২৯শে আগস্ট ঢাকার পিজি হাসপাতালে কবি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

নজরুলের সাহিত্যের প্রতি বঙ্গবন্ধুর ছিল প্রাণের টান। আমাদের রণসংগীত 'চল চল চল' সে কথাই প্রমাণ করে। আমাদের সৌভাগ্য নজরুল বাংলাদেশের ঢাকার মাটিতে শুয়ে আছেন। আর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শুয়ে আছেন টুঙ্গিপাড়ার মাটিতে। নজরুলকে বাংলাদেশে আনার কৃতিত্ব শুধু বঙ্গবন্ধুর এবং এদেশের মানুষের ভালোবাসার টানেই বঙ্গবন্ধু নজরুলকে এদেশে এনেছিলেন।

সত্যিকারের মানবিক ও গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে নজরুল আমাদের পথের দিশারি। জন্মদিনে তাঁকে আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধা। ■

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

আগুন পিতা

প্রত্যয় জসীম

আগুন লেগেছে হাজার চোখের
জমাট ক্ষোভের বাঁকে বাঁকে...
জ্বলল আগুন বাংলা জুড়ে
সব বাঙালির পাঁজর ফাঁকে...
আগুন মানুষ আগুন খেয়ে
মুক্তির আলোয় রাঙালো তাঁকে...।

তোমার জন্য কাঁদে এখনো
বাংলার ফুল, পাখি আর নদী...
আমরা আবারো যুদ্ধে যাব
আগুন পিতা ফিরে আসো যদি...।

মুজিব চিরন্তন

মোহাম্মদ মুহিবুল্লাহ

যে জন সেদিন বাজিয়েছিল স্বাধীনতার বীণ
তাঁহার তরে জমা মোদের আজন্মের ঋণ;
যার তর্জনীর এক ইশারায় লক্ষ মানুষ জড়ো
পাক হানাদার ভয় পেয়ে কাঁপছিল থরোথরো।

চারদিকে দেখি শুধু তাঁর মহৎকর্মের ছবি
তিনি তো আর কেউ নন রাজনীতির কবি;
স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে করি স্মৃতি রোমন্থন
মুজিব ছিলেন, মুজিব আছেন, মুজিব চিরন্তন।

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

গল্প

ঈদ-বোনাস

রফিকুর রশীদ

বেলুনটা গেল ফটাস করে ফেটে। মন খারাপ হওয়ারই কথা। রঙিন বেলুন। অন্য সবার চেয়ে বেশ খানিক আলাদা। লাল, নীল, হলুদ, বেগুনি, সাদা, কালো ডোরাকাটা দাগ। পরিপূর্ণ ফুলে উঠলে চোখ জুড়িয়ে যায়।অন্যের চেয়ে আলাদা বলেই ওটা সাকিবের বেশি পছন্দ। ঈদগাহ মাঠের খেলনা বাজারে গিয়ে কেনা বেলুনওলা বাঁশি। বেলুন ফুলিয়ে আঙুলের চাপ খুলে দিলেই শুরু হয় বাঁশির পোঁ। ভেতরের বাতাস না ফুরানো পর্যন্ত বাজতেই থাকে বাজতেই থাকে। এক সময় চুপসে যায় বেলুন। থেমে যায় বাঁশি। তারপর আবার গাল ফুলানো ফুঁ। আবার পেটমোটা বেলুন। আবার বাঁশির পোঁ। সাকিব ছিল খুব আনন্দে। কিন্তু হঠাৎ এটা হলো কী! একেবারে ফটকা ফটাশ। হবে না ফটাশ? শিমুল তাকে বহুবার সাবধান করেছে। বলেছে– ফেটে যাবে কিন্তু! অত ফুলাসনে। সাকিব শোনে কারও কথা! ফাটা বেলুনের দিকে তাকায়। হাতের মুঠোয় ধরা অচল বাঁশিটা দেখে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে। তারপর সেটা ছুড়ে ফেলে দেয়। রতনের বাঁশি তখনো বাজছে পোঁ পোঁ। রতন হাসছে হি হি করে। কাঁহাতক সহ্য হয় সাকিবের। রেগেমেগে তেড়ে যায় রতনের দিকে। রতন তখন ভোঁ দৌড়। এরই মাঝে সাকিবের পথ আগলে দাঁড়ায় শিমুল। হাতে পিস্তল। হাত উঁচিয়ে তাক করা। এই গুলি ছুড়ল বলে। সাকিব জানে গুলি ফুলি কিচ্ছু নেই, খেলনা পিস্তল। বড়োজোর পটকা ফোটা শব্দ হবে। তবু চটজলদি দাঁড়িয়ে পড়ে। বুক চিতিয়ে বলে, গুলি করবি নাকি?

পিস্তলের ট্রিগারে আঙুল লাগানোই ছিল শিমুলের কাজ। ফলে মুখে উত্তর দেওয়ার কোনো গরজ অনুভব করে না। আঙুল টেনে ঘোড়াটা ছেড়েই দেয়। গর্জে ওঠে পিস্তল– ঠাস! একটুখানি ধোঁয়াও বেরোয়। সাকিব গোঁয়ারের মতো রুখে ওঠে, সত্যিই গুলি করলি আমাকে?

হ্যাঁ। তুই কেন রতনের পেছনে লাগতে গেলি?

তাই বলে তুই গুলি করবি!

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

বেশ করেছি। তুই তো আর মারা যাসনি?

ঠিক আছে। রতনের বেলুন-বাঁশি কোথায় রাখে দেখছি।

সাকিবটা ওই রকমই। কোনো কিছু সহজে ছাড়ার পাত্র নয়। শিমুল, শফিক, রতন, রঞ্জু সবাই সেটা জানে। একই পাড়ার বন্ধু ওরা। ঝগড়াঝাঁটি নয়, কথা কাটাকাটি হয় মাঝেমধ্যে তবু গলায় গলায় ভাব। রঞ্জুর দাদু ওদের দেখলেই পঞ্চপাণ্ডব বলে। কেন বলে সে কথা ওরা কেউ জানে না। দাদুকে শুধাবে কে! রঞ্জুকে একবার দায়িত্ব দেওয়া হয়। অর্জুন, ভীম, নকুল– তিনটি নাম বলার পর আর মনে পড়ে না তার। অথচ দাদুর কাছে শিখে আসে পাঁচ ভাইয়ের পাঁচটি নাম। ভাই না-ই হোক, ওরা বন্ধু তো বটে পাঁচজন। মনে মনে একরকম মনে করে নেয় পঞ্চপাণ্ডবের নাম। সাকিবের গোঁয়ারতুমিতে বিরক্ত হয় চারজন। তবু সবাই মানিয়ে নেয়। কিন্তু আজ শিমুলের এমনই রাগ হয় যে আবারো গুলি করে। সাকিব ফোঁস ফোঁস করে ফোলে দু-মিনিট। তারপর বলে, থামলি কেন? আরো গুলি কর!

গুলি আর ছোড়ে না শিমুল। বরং হেসে ফেলে ফিক করে। সাকিব আবারো বলে, কই গুলি কর!

নাহ্! ঈদের দিন আর গোলাগুলি নয়। শিমুল সহসা উদার আহ্বান জানায়– আয় ঈদের কোলাকুলি করি।

সে তো একবার সকালেই করেছি।

এতক্ষণে শফিক একগাল হেসে এগিয়ে আসে। সাকিবের কাঁধে হাত রেখে বলে, ঈদ মানেই তো কোলাকুলি। সারাদিন আনন্দ। আয়, হাত মেলাই।

সাকিব হাত বাড়িয়ে দেয়। এমনকি শফিকের সঙ্গে কোলাকুলিও করে। কিন্তু গজর গজর করে জানিয়ে দেয়– রতনের সঙ্গে কথা নেই। ও আমার বেলুন ফাটিয়ে দিয়েছে। হ্যাঁ। সবাই অবাক! রতন কখন ফাটালো বেলুন! এতক্ষণে রঞ্জুর বগলের তলা থেকে পাতিহাঁস ডেকে ওঠে– প্যাঁক প্যাঁক। ছোটো বোন অঞ্জুর জন্যে কিনেছে প্লাস্টিকের পাতিহাঁস। সেই হাঁস যে এখনই এভাবে ডেকে উঠবে, কে জানত! সাকিব আবার তেতে ওঠে, ভালো হবে না বলছি!

রঞ্জু বলে, তুই অত খেপছিস কেন?

তুই তাহলে হাঁস বাজালি কেন?

শিমুল এবার পিস্তল পকেটে রাখে। হাসিমুখে এগিয়ে এসে বলে, তুই কি সেন্টু হয়ে যাচ্ছিস সাকিব?

মানে! সেন্টু কীসের?

সেন্টু মানে সেন্টিমেন্টাল। তোর কি মন খারাপ?

শফিক হা হা করে হাসে। পরিবেশ কিছুটা হালকা হয়। সে হইহই করে ওঠে, ঈদের দিনে মন খারাপ কীসের, এ্যাঁ!

অন্যেরাও আনন্দে হইহই করে। রতন ঘোষণা করে– 'নো মন খারাপ'।

ইংরেজি মেশানো বাক্য শুনে সবাই একযোগে হেসে ওঠে। সাব্বিরও যেন সহজ হয়ে যায়। সে-ই প্রস্তাব রাখে, চল রঞ্জুদের বাড়ি থেকেই শুরু হোক ঈদের খাওয়াদাওয়া।

রঞ্জুর আপত্তি নেই মোটেই। ঈদের দাওয়াত সব বাড়িতেই। এখান থেকে রঞ্জুদের বাড়ি সবচেয়ে কাছে। কাজেই ওই বাড়ি থেকে শুরু হওয়াই স্বাভাবিক। সবাই মেনেও নেয় ঐ প্রস্তাব। হঠাৎ রতন এক সমস্যার কথা মনে করিয়ে দেয়। সে ভয়ে ভয়ে বলে, রঞ্জুর দাদু যদি পঞ্চপাণ্ডবের নাম জিজ্ঞেস করেন?

মাথা খারাপ! রঞ্জু আপত্তি জানায়, ঈদের দিনে আবার পাণ্ডব-ফাণ্ডব! চল সবাই। শফিক এ সমস্যার নতুন সমাধান দেয়, আরে ধ্যাত! দাদুর নামটিও পাণ্ডবের মধ্যে ঠিক চালিয়ে দেবো দেখিস। হ্যাঁ!

এবার সবাই একযোগে হো হো করে হাসে। সেই হাসিতে ঈদের দিনের ঝলমলে রোদ্দুর নেচে ওঠে, উথাল-পাথাল বাতাস নেচে ওঠে। ওরা সবাই নাচতে নাচতে এ বাড়ি যায় ও বাড়ি যায়। যেটুকু পারে সেটুকু খায়। ছোট্ট পেটে আর ধরে কতটুকু! খাওয়ার চেয়ে বাড়ি বাড়ি যাওয়াতেই আনন্দ অধিক। ওরা পাঁচ বন্ধু সারাদিন হইহই করে সেই আনন্দ উপভোগ করে। ঈদের এই আনন্দের সঙ্গে নতুন মাত্রা যোগ হয় শিমুলদের বাড়ি এসে। সে কী আনন্দ! ঈদ উপলক্ষ্যে শিমুলের নতুন দুলাভাই এসেছেন। আনন্দের ফোয়ারা বয় সেই দুলাভাইকে ঘিরে। শিমুলের বড়ো বোন শিপ্রা আপুই সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন– সাকিব, রতন, রঞ্জু, শফিক...। দুলাভাই মিষ্টি হাসেন। বলেন– 'ফাইভ স্টার'।

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

তখনই রঞ্জুর দাদুর ফরসা ধবধবে মুখ মনে পড়ে যায় সবার। আর মনে পড়ে পঞ্চপাণ্ডবের কথা। না, দাদু আজ কাউকে পঞ্চপাণ্ডবের নাম জিজ্ঞেস করেননি। বলেছেন, আয় তোদের সঙ্গে কোলাকুলি করি। ছোটো মানুষের সঙ্গে বুড়ো মানুষের কোলাকুলি– সে এক অভিনব দৃশ্য বটে! এদিকে শিমুলদের বাড়িতে ঘটে উলটো ঘটনা। নতুন দুলাভাইয়ের সঙ্গে সবাই আড়ি দিয়ে বলে– 'ঈদ-বোনাস' না পেলে কেউ হাত মেলাবে না। সকালে ঈদের ময়দানে যাওয়ার আগে সালামের সঙ্গে সঙ্গে আদায় হয়েছে ঈদ-সেলামি। এখন হচ্ছে ঈদ-বখশিশ। মুখে বলে ঈদ-বোনাস। শিপ্রা আপু ফোঁড়ন কাটেন, তোরা কি চাকরি করিস যে বোনাস পাবি!

প্রথম প্রতিবাদ করে শিমুল নিজেই, আপু, তুমি বেশি কথা বলো না। ফেঁসে যাবে কিন্তু! তার মানে! শিপ্রা আপু তেড়ে ওঠেন, আমাকে হুমকি দেওয়া হচ্ছে?

এতক্ষণে দুলাভাই ঢুকে পড়েন ছোটোদের মধ্যে, বলেন ফাইভ স্টার যে! একসঙ্গে জ্বলে উঠলে উজ্জ্বল দেখাবেই।

সবার পক্ষ থেকে জবাব দেয় শিমুল, হ্যাঁ হ্যাঁ, ঈদ বোনাস না দিলে আমরা সবাই একসঙ্গে জ্বলে উঠব।

এদিকে উঠোনের এক কোণে কাঠের ঘোড়া নিয়ে খেলছিল শিমুলের ছোটো ভাই পলাশ। ঘোড়ার পিঠে ওঠার খুব চেষ্টা তার। কী বুঝে সে ভাইয়াদের জ্বলে ওঠার কথা শুনে ফিক করে হাসে। দুলাভাইয়ের কাছ থেকে খেলনা ঘোড়া পেয়েছে, সেটাই তার বোনাস। এই ঘোড়ায় একবার চড়ার জন্যে অবুঝ বায়না ধরেছে দুলু, উঠোনের ধুলোয় গড়াগড়ি যাচ্ছে, চিলচিৎকার কান্নায় সারা বাড়ি মাথায় তুলেছে। কিন্তু দুলুর দিকে তাকাবে কে! ওর মা কাজের মানুষ, কাজ নিয়ে ব্যস্ত। এরই এক ফাঁকে দ্রুত পায়ে ছুটে এসে দুলুর পিঠে দু-চার ঘা বসিয়ে তিনি নিজের কাজে চলে যান। নিষ্প্রাণ কাঠের ঘোড়ার দিকে তাকিয়ে দুলু কাঁদতেই থাকে বিরতিহীন।

ঈদ বলে তো শুধু নয়, শিমুলদের বোনাস দাবির পেছনে আরো যুক্তি আছে। শিপ্রা আপুর লেখাপড়া শেষ না হতেই বিয়ে হয়ে গেল মাত্র ক'মাস আগে। বিয়ের পরপরই সরকারি চাকরি হলো– প্রাইমারি স্কুলে। এই তো কদিন আগে তিনি জীবনের প্রথম বোনাস তুলেছেন। এখন স্বামীর পক্ষ নিলে শুনবে না ফাইভ স্টার! বোনাস কিংবা বখশিশ যে নামেই হোক, ওদের তো সন্তুষ্ট করতেই হবে।

দাবিদাওয়া নিয়ে বিস্তর দরকষাকষি চলে দুলাভাইয়ের সঙ্গে। অবশেষে শিপ্রা আপুর ইঙ্গিতে সারেন্ডার করেন দুলাভাই। হাত তুলে সব গোলমাল থামিয়ে দেন। তারপর জানতে চান– বলো তোমাদের দাবিটা কী! কী চাও?

তাই তো! কী দাবি জানাবে! একে অপরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে, কোনো সিদ্ধান্ত তো ঠিক করা হয়নি। ফলে এক-একজন এক এক রকম কথা বলে। কেউ জানায় টাকার দাবি। কেউ বলে ভালো করে খাওয়াতে হবে। কেউ তোলে বেড়াতে যাওয়ার প্রস্তাব। আবার বিতর্ক– বেড়াতে গেলে সেটা কোথায়।

নানাজনের নানা মত। শেষ পর্যন্ত শিপ্রা আপু সোজাসুজি ঘোষণা দেন– কাল সকালে সবাই মিলে শিলাইদহ যাব। রবীন্দ্রনাথের কুঠিবাড়ি দেখব। ফেরার পথে ছেঁউড়িয়ায় লালন আখড়ায়। সকাল আটটায় মাইক্রো ছাড়বে। সবাই রেডি থাকবি কেমন!

অত্যন্ত হাসিমুখে ঘাড় দুলিয়ে দুলাভাই জানান– এবার এই ঈদে এটাই তোমাদের ঈদ-বোনাস, এই আনন্দ ভ্রমণ। কি, খুশি তো সবাই?

সবাই একযোগে বলে, ঈদ মানেই তো খুশি। আমরা সবাই খুশি।

কিন্তু সবার মধ্যে রতন কই?

দূরে নয়, রতনকে পাওয়া গেল উঠোনের কোনায়। বসে বসে বাঁশি বাজানো শেখাচ্ছে দুলুকে। বাঁশিতে ফুঁ দিয়ে বেলুন ফোলাতে পারছে না দুলু। তবু খুশির বন্যা উপচে উঠেছে তার চোখেমুখে। খানিক আগের কান্না কোথায় হারিয়ে গেছে তার ঠিক নেই। সাকিব দৌড়ে এসে রতনকে শুধায়, বেলুন-বাঁশিটা ওকে দিয়ে দিলি?

রতন খুব আনন্দের সঙ্গে জানায়, হ্যাঁ দিলাম। ওটাই দুলুর ঈদ বোনাস। দুলুর আনাড়ি হাতে ঠিক তখনই বাঁশিটা বেজে ওঠে– পোঁ ...ও...ও...। ■

লেখক: সহযোগী অধ্যাপক, গাংনী কলেজ, মেহেরপুর

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

নিবন্ধ

কবি নজরুলের গাড়ি

মোঃ সিরাজুল ইসলাম

বন্ধুরা, শখের বশে ভালো লাগার টানে মানুষ কত কিছুই না করে। ভালো লাগার রকমেরও শেষ নেই যেন। কেউ ঘুরে বেড়াতে পছন্দ করে,কেউবা ঘুড়ি উড়াতে। কেউ মুদ্রা যোগাড় করতে ভালোবাসে, কেউ মজা পায় ভালো ভালো খেতে। আমাদের বিদ্রোহী কবি কী পছন্দ করতেন জানো? কাজী নজরুল ইসলাম ফুটবল খেলা দেখার পাগল ছিলেন। বেশি বেশি পান চিবোতেন, চা পান করতেন আর গাড়ি চড়তে তাঁর ভীষণ ভালো লাগত। তাহলে একটু গোঁড়া থেকেই তোমাদের বলি—

শত বছর আগের কথা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়েছে। সেই যুদ্ধে অংশ নেওয়া বাঙালি সৈনিক হাবিলদার নজরুলের চাকরির অবসান ঘটেছে। নজরুল চলে এলেন কলকাতায়। বিভিন্ন পত্রিকায় ছাপা তাঁর লেখার সম্মানীর টাকা হলো তাঁর আয়ের উৎস। ভাড়া বাড়িতে থাকেন। অথচ গাড়িতে চড়ার অদম্য আগ্রহ কবি নজরুলের। অন্য খাতে খরচ কম করে হলেও মোটর কারে করেই তাঁর চলাফেরা করা চাই। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ছিলেন নজরুলের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। নজরুলের গাড়ি চড়ার বাতিক নিয়ে তিনি লিখেছেন,

...পান চিবোতে চিবোতে বেড়িয়ে যাচ্ছিল নজরুল। আমাকে বললে, 'চলো তোমাকে পৌঁছে দিয়ে যাই।' বললাম, 'খুব হয়েছে,তুমি যাবে পশ্চিমে,আমি যাবো পূর্বে।' নজরুল বললেন,'গাড়ি এনেছো তো, মোটর কার?' মোটর কার এলে আর রক্ষে নেই। যেখানে খুশি তাঁকে নিয়ে যেতে পারো। পাড়াগাঁয়ের ছেলে নজরুল-এই মোটর কারে চড়ার শখটা তাঁর গেল না কিছুতেই। মোটরে চড়িয়ে কেউ যদি ওকে যেখানেই নিয়ে যায় তো ও তক্ষুণি যেতে রাজি হয়ে যাবে।

একদিন হয়েছে কী, বিকেলে শৈলেনদের বিডন স্ট্রিটের বাড়িতে বসে বসে গল্প করছি শৈলেনের সঙ্গে, এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে নজরুল ঢুকল। আমাদের কাছে এসে বললে, 'চারটে টাকা দাও। বাইরে ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে।' রাস্তায় গিয়ে দেখলাম, ট্যাক্সির ভাড়া উঠেছে পাঁচ টাকা। নজরুলের পকেটে ছিল মাত্র একটি টাকা। সেই টাকাটি ড্রাইভারের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলেছে, 'টাকা আনছি, তুমি দাঁড়াও।'

(শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, মানুষ নজরুল, নজরুল স্মৃতি, পৃ.৫৩)।

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

সাম্যবাদের কবি রিকশায় চড়া পছন্দ করতেন না। পাবলিক বাস, ট্রামে চড়তেন না। নজরুলের ছিল ট্যাক্সি-গাড়িতে চড়ার খেয়াল। এই লেখক নিয়ে আয়নুল হক খাঁ লিখছেন, কবি তখন হরি ঘোষ স্ট্রিটে থাকতেন এবং মাসিক সওগাতে নিয়মিত লিখতেন। ১১ নম্বর ওয়েলেসলি স্ট্রিটে সওগাত অফিসে কবি প্রায়ই আসতেন,আড্ডা বসতো, আমিও যেতাম। কবির ছিল গতির প্রতি সীমাহীন আসক্তি। তিনি পারতপক্ষে ট্রামে যাতায়াত করতে চাইতেন না; বলতেন 'ট্রাম টিকির টিকির করে থেমে থেমে চলে। এটা আমার অসহ্য লাগে। ট্যাক্সি যখন উর্ধ্বশ্বাসে

তিনি জবাবে বলেছিলেন,'আপনাদের কাছে খরচ মনে হতে পারে, আমার কাছে তা মনে হয় না। ট্যাক্সিতে চড়ে আমি প্রচুর আনন্দ পাই।' *(নজরুল চরিত্রের দু-একটি দিক, আয়নুল হক খাঁ, নজরুল স্মৃতি, পৃ. ১৭৩)*

আয়নুল হক খাঁ আরো লিখেছেন, 'গতির প্রতি কবির এই আসক্তি চরম পরিণতি লাভ করল। শুনলাম, কবি নিজেই একটা মোটরগাড়ি কিনেছেন, একদিন তা দেখতেও পেলাম। কবি তাঁর ভালো ভালো কবিতাগুলোর কপিরাইট ডিএম লাইব্রেরির মালিকের কাছে বিক্রি করে মোটরের টাকা সংগ্রহ করেছেন।

কবি নজরুল ইসলামের গাড়ি

ছুটে চলে,তখন আমার মনও যেন এক অজানা দেশে পাড়ি দেয়। সওগাত কর্তৃপক্ষ কবি নজরুলকে যে সম্মানী দিতেন তার অনেক অংশ চলে যেত ট্যাক্সির ভাড়া বাবদ। ফুটবল খেলা দেখার নেশা ছিল কবির প্রচণ্ড রকমের। আড্ডা শেষে বন্ধু প্রেমেন্দ্র মিত্র এবং আরো দু-একজনকে নিয়ে ট্যাক্সি করে ময়দানে খেলা দেখতে যেতেন। খেলার পর আবার ট্যাক্সি করেই কবি বাড়ি ফিরতেন।

আমরা একদিন জিজ্ঞেস করলাম, আপনি ট্যাক্সিতে টাকা খরচ করেন কেন?

শিশুর মতো সরল কবি তাঁর আশা পূর্ণ হওয়াতে পরম আনন্দ লাভ করলেন।' (নজরুল চরিত্রের দু-একটি দিক,আয়নুল হক খাঁ,নজরুল স্মৃতি,পৃ. ১৭৩)

সময়টা ছিলো ১৯৩১। জীবনের নানা ওঠাপড়ার পর কাজী নজরুল ইসলাম যুক্ত হলেন চলচ্চিত্র নিরমাতা সংস্থা ম্যাডান থিয়েটার র সংগে বেতনভোগী সুরকার হিসেবে। বহুদিন পর হাতে তখন বেশ অনেক টাকা। বহু দিনের সখ একটা গাড়ি কেনার জন্য রীতিমতো মুখিয়ে উঠলেন নজরুল। ওই বছরই গাড়িও কিনেই ফেললেন নজরুল। বাড়িতে এলো সেই সময়ের দামী

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

গাড়ি ক্রাইসলার। জীবনে কত সংগ্রামর পর একটা স্বপ্ন পূরণ। আনন্দে অধীর নজরুল কারনে অকারণে গাড়ি নিয়ে ঘুরতে বেরোন।

একা নন, বন্ধুদের সংগে নিয়েই। একবার সাহিত্যিক স্বপনবুড়োকে সঙ্গে করে এই ক্রাইসলার চেপেই নজরুল রওনা হলেন দার্জিলিঙে। সেখানে তখন ছুটি কাটাতে গিয়েছেন রবীন্দ্রনাথও। পাহাড়ে গিয়েই নজরুল ছুটলেন কবিগুরুর সংগে দেখা করতে। নজরুল কে দেখে আনন্দে মেতে উঠলেন রবীন্দ্রনাথ।

নজরুলের গাড়ি কেনা আর জৌলুসপূর্ণ দিনযাপন নিয়ে জুলফিকার হায়দার লিখেছেন, '১৯৩২ সালের কথা। কবি সে সময় ৩৯, সীতানাথ রোডে এক ভাড়াটিয়া বাড়িতে বাস করতেন। অক্টোবর মাসের শেষের দিকে এক রবিবারের সকালবেলা আমি কবির বাড়িতে গেলাম। তখন কবির বাড়িতে নেপালি দারোয়ান, গ্যারেজে দামি মোটর। বেশ শান শওকতের সঙ্গেই তিনি ছিলেন'। (জুলফিকার হায়দার, স্মৃতি রঙ্গ, নজরুল স্মৃতি, পৃ: ৮৫)

ভক্তি-শ্রদ্ধার সাথে লেখক দেব নারায়ণ গুপ্ত কবির গাড়ির বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে– 'কবি উত্তর কলকাতার শিমলা ব্যায়াম সমিতির পাশের গলি সীতানাথ রোডে থাকতেন।...কবির বাড়ির কাছাকাছি বিবেকানন্দ রোডে আমার এক বন্ধুর বাড়িতে তখন প্রায়ই আমি যেতাম। দেখতাম কবি তাঁর বাড়ি থেকে বেরুতেন চকোলেট রঙের মস্তবড়ো এক গাড়িতে চড়ে। হুড ঢাকা গাড়ি। কবির সেই সৌম্যমূর্তি দেখে দেব দর্শনের আনন্দ পেতাম'। (আজও মনে আছে, দেব নারায়ণ গুপ্ত, নজরুল স্মৃতি, পৃ. ১৯৫) ■

লেখক: প্রাবন্ধিক ও সহযোগী অধ্যাপক, খুলনা বিএল কলেজ

রাফান ইবনে মেহেদী, ৪র্থ শ্রেণি, বিএএফ শাহীন কলেজ, ঢাকা

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

নিবন্ধ

আমার মা

আরিফুল ইসলাম

ছোট্ট একটি শব্দ 'মা'। মায়ের মতো আপনজন আর কেউ নেই। আমাদের জীবনে 'মা' এমন একটা জায়গায়, যা আমরা সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করতে পারি না। মা জীবনে চলার পথে তপ্ত রোদের একফালি ছায়া। মা-ই একমাত্র ব্যক্তি যিনি একেবারে ভেতর থেকে বোঝেন, তাঁকে কিছু বলে দিতে হয় না, মুখ দেখলেই কেমন করে যেন বুঝে ফেলেন আমাদের মনের অবস্থা। আর সময় মতো হাতের কাছে চলে আসে সঠিক সমাধান। যে সন্তানের কাছে তাঁর মায়ের স্নেহ থাকে সে সারা পৃথিবী জয় করতে পারে। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর এই নিঃস্বার্থ ভালোবাসা বিদ্যমান। মানব জীবনে মায়ের স্থান অনেক উর্ধ্বে, সর্বাধিক সম্মানের ও শ্রদ্ধার। যুগে যুগে মাকে নিয়ে রচিত হয়েছে গল্প, গান, ছড়া, কবিতা।

মাকে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জানাতে নির্দিষ্ট কোনো দিন নেই। মায়ের প্রতি ভালোবাসা প্রতিটি ক্ষণের। তারপরও মাকে শ্রদ্ধা জানাতে প্রতি বছর মে মাসের দ্বিতীয় রোববার পালিত হয় আন্তর্জাতিক মা দিবস। মায়ের প্রতি অধিক শ্রদ্ধা, সমাজে মায়ের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা, ভালোবাসা ও বিশেষ সম্মান জানানো এবং নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিত করার জন্যই বিশ্ব মা দিবসের আয়োজন।

মা দিবস পালনের ইতিহাস অনেক পুরনো। এ দিবসটির উদ্যোক্তা হলেন মার্কিন অ্যানা জার্ভিস। ১৯০৫ সালের ১২ই মে তাঁর মা অ্যান মেরি রিভস জার্ভিস মারা যান। মায়ের মৃত্যুতে মুষড়ে পড়েন আনা। তিনি মায়ের মৃত্যুর দু'বছর পর প্রথমবার 'মায়ের জন্য ভালোবাসা' শিরোনামে মা দিবস উদযাপন করেন। পাশাপাশি জার্ভিস এ বিষয়ে লেখালেখি এবং বিশ্বের নানা স্থানে বক্তৃতা করেন। একটা সময় বিষয়টি নিয়ে নানা মহলে আলোচনা হয়, আসে নানান প্রতিবন্ধকতাও; কিন্তু আনা জার্ভিস পিছপা হননি। অবশেষে ১৯১৪ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট উড্র উইলসনের স্বাক্ষরে 'মা দিবস' আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করে। তবে দিবসটি উদযাপন বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকম হওয়ায় একই তারিখে উদযাপিত হয় না। তবে বেশির ভাগ দেশে মে মাসের দ্বিতীয় রোববার দিনটি উদ্‌যাপন করা হয়।

সন্তানের ভালোর জন্য মায়ের চিন্তা সারাক্ষণ। সন্তানের অসুখে মা অস্থির হয়ে পড়েন। নিজের জীবন দিয়ে হলেও মা সন্তানের সুখ-শান্তি ও কল্যাণ কামনা করেন। সন্তানের সফলতায় মা আনন্দিত হন। মায়ের স্নেহ-মমতা ও দোয়া ছাড়া কেউ উন্নতি লাভ করতে পারে না। মায়ের প্রতি সন্তানের অনেক দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। মায়ের প্রতি সন্তানের কর্তব্য যে কত বড়ো তা ভেবে শেষ করা যায় না। সারাজীবন তাঁর সেবা করলেও সে ঋণ শোধ হবার নয়। হাদিস শরীফে নানাভাবে এসেছে মায়ের কথা। একবার নবীজি (সা.)-কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন, 'আমার সদ্ব্যবহার পাওয়ার বেশি অধিকারী কে? তখন রাসূল (সা.) বললেন, তোমার মা। লোকটি বলল, তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। লোকটি আবার জিজ্ঞেস করলেন, তারপর কে? নবীজি (সা.) বললেন, তোমার মা।

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

চতুর্থবার লোকটি আবার একই প্রশ্ন করলেন এবার নবীজি (সা.) বললেন, অতঃপর তোমার বাবা (বুখারি ও মুসলিম)। রাসূলুল্লাহ (সা.) আরো বলেছেন, 'মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের বেহেশত।'

সন্তানের জন্য সেরা উপহার হলো মা। মায়ের কাছে সন্তান যেমন প্রাণের চেয়েও আপন, সন্তানের কাছেও মা তেমনি সেরা ধন। মায়ের দোয়া সাথে থাকলে জীবনে চলার পথে সব বাধা দূর হয়ে যায়। হযরত আবদুল কাদের জিলানী (রা.) ডাকাত দল দ্বারা আক্রান্ত হয়েও মায়ের আদেশ পালন করেছেন সত্য কথা বলে। এতে ডাকাত সর্দার অভিভূত হয়ে সৎ পথ অবলম্বন করেছিল। বায়েজিদ বোস্তামী অসুস্থ মায়ের শিয়রে সারারাত পানির গ্লাস হাতে দাঁড়িয়ে থাকা, আর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মায়ের ডাকে দুর্যোগপূর্ণ রাতেও সাঁতার কেটে দামোদর নদ পার হওয়ার গল্প সবারই জানা। এরা সকলেই জগতের মহান ব্যক্তি ছিলেন। মাকে স্মরণ করে আব্রাহাম লিংকন বলেছিলেন, 'আমি যা কিছু পেয়েছি, যা কিছু হয়েছি অথবা যা হতে আশা করি তার জন্য আমি আমার মায়ের কাছে ঋণী।' সম্রাট নেপোলিয়ন বোনাপার্ট তাঁর মাকে দেখেছেন বুদ্ধি, আত্মমর্যাদাবোধ, ধৈর্য ও সাহসিকতার সঙ্গে ১৩ সন্তানকে লালনপালন করতে। তাই তো তিনি বলেছেন, 'আমাকে একটি ভালো মা দাও, আমি তোমাদের একটি ভালো জাতি উপহার দেবো।'

তাই তো 'মা দিবস' মায়েদের আরো সচেতন করে আদর্শ মা হওয়ার অনুপ্রেরণা জোগাবে এবং মাতৃত্বসুলভ উন্নত মননশীলতার জন্ম দেবে; যার পরোক্ষ ফল হিসেবে দেশ ও জাতি উপকৃত হবে এবং আগামী প্রজন্ম পাবে একটি সুখী, সুন্দর ও সমৃদ্ধশীল বাংলাদেশ। ■

লেখক: প্রাবন্ধিক

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

মা আমার

তামিম হোসেন

মা কথাটি মধুর অতি
ডাকতে লাগে ভালো
মা যে আমার চোখের মণি
দুই নয়নের আলো।
জড়িয়ে ধরে মা যখন
করেন আমায় আদর
হৃদয় ভরে যায় তখন
আরো ভরে পাজর।

৭ম শ্রেণি, শরিফাবাদ উচ্চ বিদ্যালয়, নীলফামারি

প্রিয় মা

সায়মা আক্তার

মা গো বলে ডাকি যখন
পরাণ যায় যে ভরে
সব কষ্ট এক নিমিষে
যায় যে আমার সরে।
কত আদর নিয়ে আমায়
নিতে তুমি কোলে
সে স্মৃতি আজও মাগো
যাইনি আমি ভুলে।

৬ষ্ঠ শ্রেণি, মডার্ণ স্কুল, সাভার, ঢাকা

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

কবিতাগুচ্ছ

আকাশ ছুঁয়ে দেখি

ফারুক হাসান

তোমরা সবাই আকাশ পারের
ওই নদীটা চেনো?
বলতে পারো, সেখান থেকে
বৃষ্টি ঝরে কেন?
ভাবুক মনে হাজার রকম
ভাবনা আসে কত!
দিগ্‌বিদিকে মন ছুটে যায়
অধীর অবিরত।
মেঘগুলো সব উড়ে বেড়ায়
মন ভালো নেই রত্তি,
মেঘের নদী বৃষ্টি ঝরায়-
এটাই জেনো সত্যি।
ভাবনাগুলো মেঘ হতে চায়
উড়তে যাবে সেকি!
ইচ্ছেটা হয় মেঘ হয়ে যাই
আকাশ ছুঁয়ে দেখি।

মাস্ক

আ.ফ.ম. মোদাচ্ছের আলী

সবাইকে আজ বলি চলো
আমি বলি তুমি বলো
মাস্কটা রাখো মুখে,
এটাই এখন করতে হবে
থাকতে হলে সুখে।

স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলি
আসো সবে মিলে বলি

কোভিড করি জয়,
মাস্কটা মুখে পড়লে পরে
থাকবে না তো ভয়।
স্বাস্থ্যবিধির শর্ত প্রথম
মাস্কটি রাখো মুখে
থাকবে সবাই সুখে।
করো না আর হেলা তুমি
পড়তে মুখে মাস্ক
এটাই এখন টাস্ক।

আমাদের গ্রাম

তাসনিম সুহিনা

গ্রামটি যেন ছবির মতো
তুলি দিয়ে আঁকা
ফুল-ফল আর ছায়ায় ঘেরা
কৃষ্ণচূড়ায় ঢাকা।
আমগাছ আর লিচু গাছ
সারি সারি খাঁড়া
পাখপাখালির বসেছে মেলা
নেইকো কোনো তাড়া।
আকাশ দিয়ে মেঘ উড়ে যায়
যেন বাতাসেতে ভাসে
শেফালি ফুল সবুজ ঘাসে
মুচকি দিয়ে হাসে।

নবম শ্রেণি, পি.এন.সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, রাজশাহী

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

সায়েন্স ফিকশন

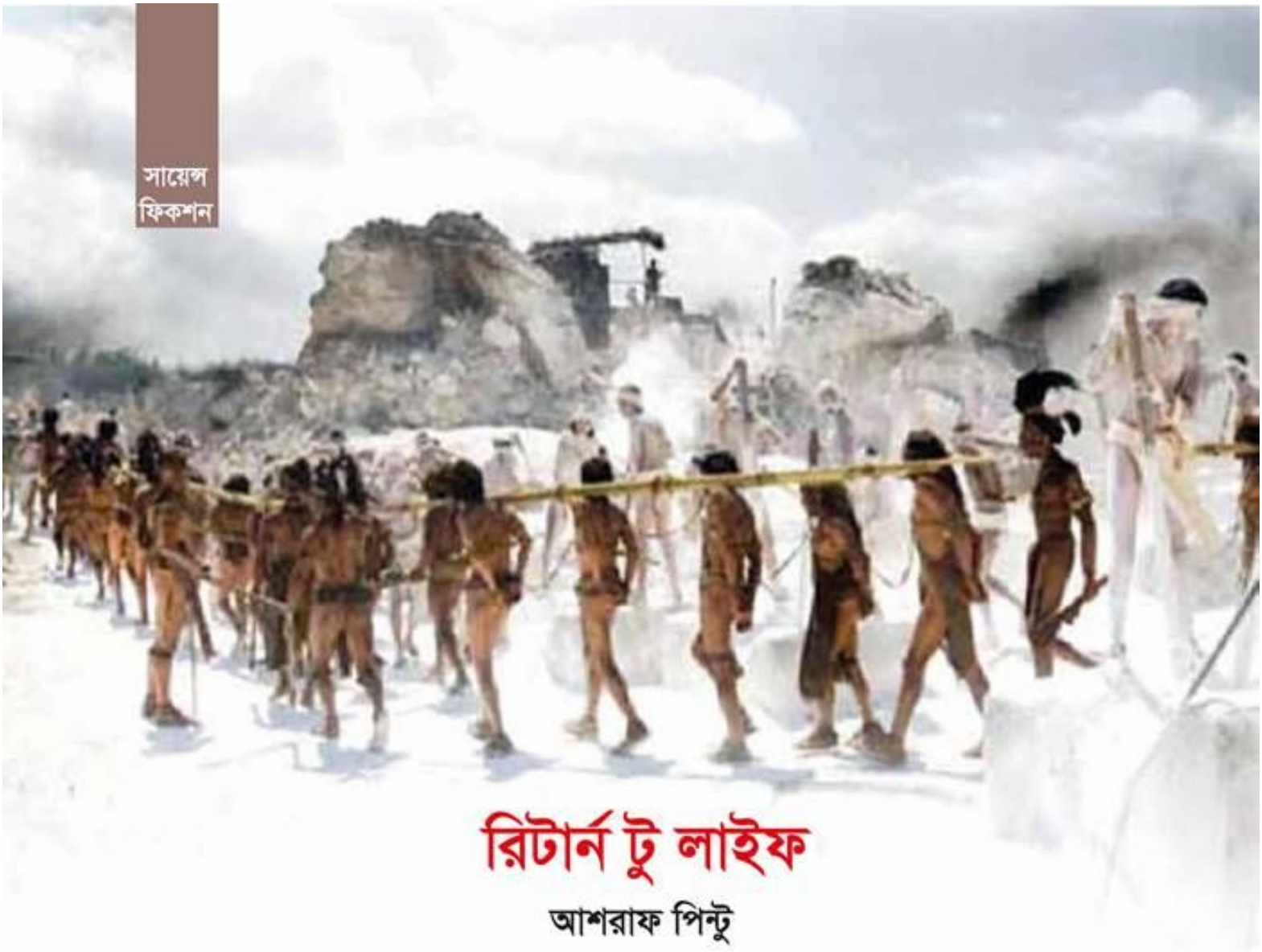

রিটার্ন টু লাইফ

আশরাফ পিন্টু

সাঁ করে একটি তীর এসে স্বননের কয়েক হাত সামনে পড়ে। তাকিয়ে দেখে অনেকগুলো জংলি মানুষ ওর দিকে তীর তাক করে দূরে দাঁড়িয়ে আছে। স্বনন হাঁটতে হাঁটতে গহীন অরণ্যের মধ্যে চলে এসেছে। পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখে– অনেক দূরে চলে এসেছে। বন্ধুদের কাউকে দেখা যাচ্ছে না। জিপটি তো আরো দূরে মেইনরোডে রয়েছে। বনভূমির এ দিকটা ওর খুব ভালো লাগছিল। প্রকৃতির রূপে মুগ্ধ হয়ে কোন অজান্তে এদিকটায় চলে এসেছে টেরই পায়নি। পালাতে গেলে ওরা হয়ত আবার তীর ছুঁড়তে পারে; এতে বিপদ ঘটার সম্ভবনাই বেশি। দেখা যাক ওরা কী করে! স্বনন পিছন ফিরে না গিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

ইতোমধ্যে জংলিরা তীর তাক করে এক পা-দুপা করে স্বননের দিকে এগিয়ে আসছে। কাছে এসে ওরা স্বননকে বৃত্তাকার হয়ে ঘিরে ফেলে। স্বনন বুঝতে পারে ওরা ওকে বন্দি করবে। এদের হাত থেকে পালানোর কোনো পথ নেই। স্বনন ভাগ্যের উপর ছেড়ে দেয় নিজেকে। দেখা যাক কী করে ওরা?

ওদের মধ্য থেকে একজন ইশারায় ওকে পথ চলতে বলে। ওদের দলনেতা আগে আগে হাঁটতে থাকে; স্বননকে তার পিছনে হাঁটতে ইশারা করে। স্বনন দলনেতার পিছন পিছন হাঁটতে থাকে। বাকিরা ওদের অনুসরণ করে।

প্রায় দুই কিলোমিটার পথ হাঁটার পর ওরা অন্য একটি বনাঞ্চলে এসে পৌছে। একই এলাকার বনভূমি হলেও এ বনভূমিটি পূর্বের বনভূমির মতো নয়। গাছপালাগুলোও কেমন অপরিচিত বলে মনে হচ্ছে। পরিচিত তেমন পশুপাখিও চোখে পড়ছে না। হঠাৎ এক বিকট শব্দে চমকে ওঠে স্বনন। শব্দটি তেমন পরিচিত বলে মনে হয় না তবে শুনে বোঝা যাচ্ছে এটা হিংস্র কোনো পশুর ডাক হবে হয়ত।

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

জংলিরা একটি দোতলা বিল্ডিঙের সামনে এসে থেমে যায়। এমন গহীন অরণ্যের মধ্যে বিল্ডিং এল কোত্থেকে? ফরেস্ট অফিস-টফিস নয় তো? এত ভিতরে ফরেস্ট অফিস! বিল্ডিংটির সামনে উঠোনের মতো ফাঁকা জায়গা। ফাঁকা জায়গাটির চারপাশে বিভিন্ন প্রজাতির গাছপালা ছড়িয়ে রয়েছে।

জংলিরা এবার স্বননকে হাত ধরে টেনে এনে একটি গাছের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলে। স্বনন এতক্ষণ ওদের সঙ্গে মুক্তভাবে হেঁটে এসেছে। এটাই আশ্চর্যের ব্যাপার। কাজেই ও এতে মোটেই অবাক হয় না। এখন দেখা যাক কী করে ওরা? মৃত্যু নইলে অন্য কিছু। স্বনন বিভিন্ন গ্রহ-উপগ্রহ ভ্রমণ করেছে, বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীনও হয়েছে; বেঁচেও এসেছে। কাজেই নিজ গ্রহের মানুষের হাতে বন্দি হয়ে ওর ভিতরে ভয়ের অনুভূতি তেমন কাজ করে না। ও অপেক্ষায় থাকে পরবর্তী ঘটনা মোকাবেলার জন্য। জংলিদের দলনেতা বিল্ডিঙের একটি রুমের মধ্যে ঢুকে পড়ে। অন্যরা ওকে ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকে।

২

কিছুক্ষণ পর বিল্ডিঙের ভিতর থেকে দলনেতার সাথে স্যুট-টাই পরা একজন ভদ্রলোক বেরিয়ে আসে। আস্তে আস্তে স্বননের দিকে এগুতে থাকে। স্বননের দিকে চোখ পড়তেই একটু অবাক হয়। স্বননও অবাক হয়ে দেখতে থাকে লোকটিকে। এই গহীন অরণ্যের মধ্যে ভদ্রলোক! নিশ্চয়ই কোনো ফরেস্ট অফিসার হবে। কাছে আসতেই মনের অজান্তে বলে ফেলে, পিটার তুই!

–আরে ফ্রেন্ড স্বনন! তুমি এখানে কীভাবে এলে? পিটারও অবাক হয়।

–ভুল করে এ পথে চলে এসেছিলাম। তাই এরা...

–শীঘ্রই ওর বাঁধন খুলে দাও। ও আমার বাল্যবন্ধু।

পিটারের কড়া নির্দেশে এক জংলি গিয়ে স্বননের বাঁধন খুলে দেয়। বাঁধন মুক্ত হয়ে স্বনন পিটারের দিকে হ্যান্ডশেকের জন্য হাত বাড়িয়ে দেয়। পিটার হ্যান্ডশেক করার পর স্বননকে বুকে টেনে নেয়। বলে, ফ্রেন্ড মনে কিছু করো না। এটা আমার এরিয়া। ওরা আমারই লোক– সব পাহাড়ায় থাকে। অচেনা কেউ ঢুকলে এমন অবস্থা করে।

–আমি যা ভাবছিলাম তাই; তুমি এখানকার ফরেস্ট অফিসার?

–না।

–তবে?

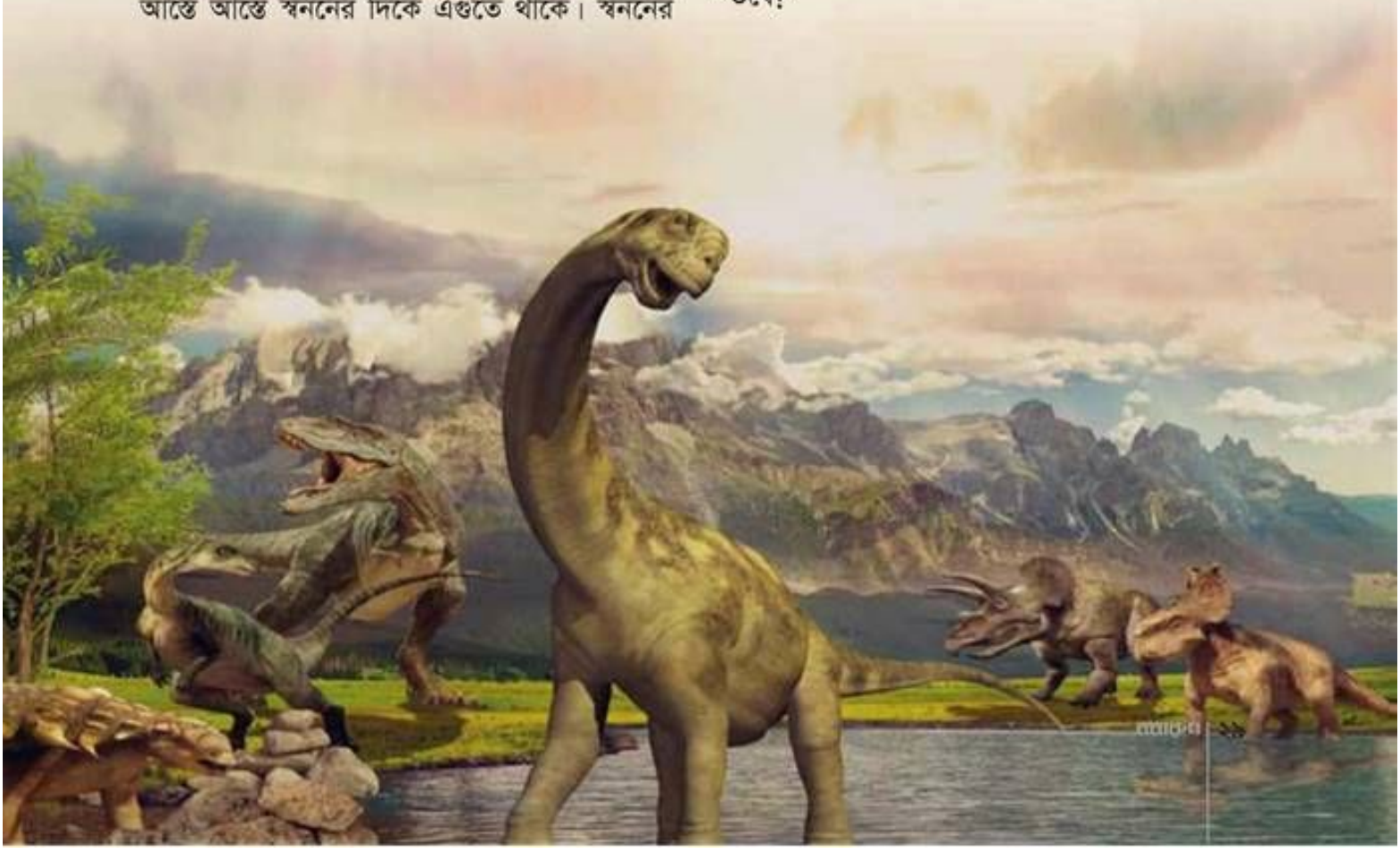

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

–আমি এখানে গবেষণা করি। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ার। মনে নেই ছাত্রজীবনে লিংকন আর আমার মধ্যে খুব কম্পিটিশন ছিল। ও একবার সেকেন্ড হতো, আরেকবার আমি।

–হ্যাঁ মনে আছে।

–তুমি তো বরাবরই ফার্স্ট বয় ছিলে। এরপর তো তুমি আরেক লাইনে চলে গেলে। হ্যাঁ, এখন তুমি কী করছ?

–এখন আমি মহাকাশ বিজ্ঞানী। বিভিন্ন গ্রহে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

–তাই তো দেখাসাক্ষাৎ নেই অনেক দিন।

–হ্যাঁ। এখন বলো তোমার গবেষণার অগ্রগতি কেমন? মানে কী কী বিষয়ে রিসার্চ করছ?

–বলব সব। আসো, ভিতরে আসো।

ওরা দুজন বিল্ডিঙের দিকে পা বাড়াতেই আবার কানে আসে সেই বিকট চিৎকার। স্বনন এখানে ঢোকার পূর্বে এমন শব্দ একবার শুনেছিল। এবার শব্দটি অনেক জোরালো মনে হচ্ছে। হয়ত কাছে থেকেই শব্দটি ভেসে আসছে। স্বনন কৌতূহল দমাতে না পেরে পিটারের দিকে তাকিয়ে বলে, এটা কোন প্রাণীর ডাক?

পিটার কোনো জবাব না দিয়ে মৃদু হেসে বলে, পরে জানা যাবে, আগে ভিতরে চলো।

স্বনন আর কথা না বাড়িয়ে পিটারের পিছু পিছু বিল্ডিঙের ভিতরে ঢুকে পড়ে।

৩

দোতলা বিল্ডিংটি বেশ বড়ো আকারের। ভিতরের রুমগুলোও বেশ বড়ো। পিটার স্বননকে নিয়ে ড্রয়িংরুমে বসায়। রুমের দেয়ালে টাঙানো রয়েছে বিভিন্ন প্রাণীর ছবি। এছাড়া রয়েছে মানবদেহের কঙ্কালসহ বিভিন্ন প্রাণীর কঙ্কাল।

–বসো ফ্রেন্ড। কী দেখছ অমন করে?

–দেয়ালে টাঙানো অচেনা প্রাণীর ছবিগুলো দেখছিলাম। তুমি কি এসব প্রাণী নিয়ে রিসার্চ করছ?

–হু, তবে এদের জীবাশ্ম নিয়ে।

–বুঝলাম না।

–আমি প্রাগৈতিহাসিক যুগের প্রাণীদের জীবাশ্ম নিয়ে রিসার্চ করছি।

–কিছু পেলে?

–হ্যাঁ, পেয়েছি তো।

–কী পেলে?

–আগে বসো, নাশতা-টাশতা খাও; তারপর বলি।

পিটারের কথায় স্বনন সোফায় বসে পড়ে। পিটার পাশের রুমে চলে যায়। স্বনন সেলফ থেকে একটি বই নিয়ে খুলে পাতা উলটাতে থাকে। এমন সময় পূর্বের সেই ডাকটি শোনা যায়। ডাকটি খুব তীব্রভাবে কানে এসে আঘাত করে। তাতে মনে হয় কাছে কোথাও লুকিয়ে থেকে কোনো পশু ডাকছে। স্বনন বইটি টেবিলের উপর রেখে জানালার ধারে চলে যায়। জানালা দিয়ে এপাশে ওপাশে তাকাতেই চোখে পড়ে একটি লম্বা গলার ডাইনোসরের। ডাইনোসরটি কাঁটাতার ঘেরা বাগানে ঘোরাফেরা করছে। স্বনন মনে মনে ভাবে– এটা হয়ত প্লাস্টিকের তৈরি অ্যানিমেশন ডাইনোসর; যা ছোটোবেলায় জুরাসিক পার্ক সিনেমায় দেখেছে অনেকবার। এটা কি তাহলে পিটারের অ্যানিমেশন পার্ক? অ্যানিমেশন প্রযুক্তির সাথেও কি ও জড়িত? এমন সময় ওর চোখে পড়ে একটি বৃহদাকৃতির হাতি ডাইনোসরটির পাশ দিয়ে হেলেদুলে চলে যাচ্ছে। আরে! এটা তো সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগের 'ম্যামথ'– হাতিদের পূর্বপুরুষ।

তাহলে বোঝা যাচ্ছে পিটার প্রাগৈতিহাসিক যুগের প্রাণীদের দিয়ে জুরাসিক পার্ক বানিয়েছে।

–কী দেখছিস অমন করে?

পিটারের কথায় স্বনন পিছন ফিরে তাকায়। দেখে একটি ছোটো ট্রলিতে করে নাশতা নিয়ে এসেছে। –সাহায্যকারী ছেলেটা ছুটিতে আছে, নিজে নিজে তৈরি করতে একটু দেরি হয়ে গেল। আয় খেয়ে নিই।

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

পিটারের কথায় জানালার কাছে থেকে সরে এসে সোফায় বসে। ট্রলির পিরিচ থেকে একটি বিস্কিট মুখে পুড়ে দিয়ে চাবাতে চাবাতে বলে, ডাইনোসর দেখছিলাম, তুই দেখছি জুরাসিক পার্ক বানিয়ে ফেলেছিস।

স্বননের কথায় পিটার মৃদু হেসে ট্রলি থেকে এক কাপ চা হাতে তুলে নেয়। চায়ের কাপে পর পর দু'বার চুমুক দিয়ে একটু তৃপ্তির ঢেকুর তুলে বলে, ওটা অ্যানিমেশন ডাইনোসর নয়, বাস্তব ডাইনোসর।

–কী বলিছ! এটা কীভাবে সম্ভব? স্বনন অবাক চোখে তাকায় পিটারের দিকে।

–সত্যি বলছি। ওগুলো আমার সৃষ্টি।

পিটারের কথা শুনে স্বনন কিছুক্ষণ হতভম্বের মতো ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। এরপর ট্রলি থেকে পানির গ্লাস হাতে নিয়ে ঢক ঢক করে কয়েক ঢোক পানি খায়। একটু দম নিয়ে বলে, কীভাবে করলি এসব?

–জীবাশ্ম থেকে।

–জীবাশ্ম থেকে! কীভাবে সম্ভব?

–ক্লোন পদ্ধতিতে।

–ক্লোন তো সজীব কোষ থেকে হয়। জীবাশ্ম থেকে কীভাবে তা সম্ভব?

–অস্থি বা হাড় হলো তরল যোজককলা। লাখ লাখ বছর পূর্বের জীবাশ্মগুলো আমি রিসার্চ করে ওর মধ্যে খুব অল্পই সজীব কোষ আবিষ্কার করেছি। আর তা থেকেই ক্লোন পদ্ধতিতে ডাইনোসর বা ম্যামথ সৃষ্টি করেছি।

পিটারের কথা স্বননের কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছিল না। ও শুধু বলছিল– 'কীভাবে সম্ভব'? ওর কথার উত্তর না দিয়ে পিটার স্বননকে হাত ধরে টেনে নিয়ে পাশের রুমে চলে যায়।

৪

এ রুমটি পিটারের রিসার্চ রুম। বিশাল আকৃতির এ রুমে পিটারের নানা গবেষণার উপাদান রয়েছে। টেবিল ও সেলফে ছড়ানো রয়েছে বিভিন্ন প্রাণীর জীবাশ্ম ও হাড়গোড়। সেগুলো পেরিয়ে পিটার

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

স্বননকে গ্লাস লাগানো একটি রুমের সামনে এনে দাঁড় করায়। স্বনন দেখে গ্লাসের ভিতরে বৃদ্ধ বয়সের কয়েকজন নারী-পুরুষ ঘোরাফেরা করছে। কেউ চেয়ার-টেবিলে বসে খাচ্ছে, কেউ মেঝেতে বসে দাবা-লুডু খেলছে, কেউ বা বিছানায় শুয়ে আরাম করছে। এমন দৃশ্য দেখে স্বনন জিজ্ঞেস করে, এরা কারা?

পিটার জবাব দেয়, এরা আমার পিতামহ, পিতামহী, প্রপিতামহ, প্রপিতামহী ও তাদের পূর্বপুরুষ।

–কী বলছিস এসব! স্বনন আবার অবাক হয়।

–বিশ্বাস হচ্ছে না?

স্বনন কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলে, না- মা-নে... কীভাবে করলি এসব?

–ঐ একই পদ্ধতিতে।

–ওনারা কী সেই আগের সত্তা ফিরে পেয়েছে?

–তা বলতে পারব না। কেননা ওনাদের সময় তো আমার জন্ম হয়নি; কাজেই ওনাদের স্বভাব-চরিত্র আমার জানা নেই। তবে দেখ– আমার চেহারার সাথে ওনাদের চেহারার অনেকটাই মিল আছে।

পিটারের কথায় স্বনন ভিতরের বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের দিকে তীক্ষ্ণ নজর দেয়; এরপর পিটারের দিকে তাকিয়ে বলে, হ্যাঁ।

–ওনাদের সাথে কথা বলবি?

–না, থাক।

–তবে বিশ্বাস করলি তো এটা, আমার রিসার্চের ফল।

স্বনন মাথা নেড়ে সম্মতি প্রকাশ করে।

–চল, এবার তোকে আরেকটা অভিনব আবিষ্কার দেখাই।

পিটার স্বননকে নিয়ে কাচ লাগানো আরেকটা রুমের ভিতরে ঢুকে পড়ে। এ রুমটি পূর্বের রুমের চেয়ে অনেক ছোটো। কাচের ভিতরে ফাঁকা দেখে স্বনন বলে, এর ভিতরে তো কাউকে দেখা যাচ্ছে না?

–এখানে একটিমাত্র জীব আছে। হয়ত কোথাও বসে আছে অথবা ঘুমিয়ে আছে। পিটার কাচের ছোটো বৃত্তাকার খোলা অংশে মুখ লাগিয়ে উচ্চৈঃস্বরে ডাকে, মানবোত্তর, তুমি কোথায়? এদিকে এসো।

পিটারের ডাক শুনে কিছুক্ষণ পর এক অদ্ভুত আকৃতির জীব এসে ওদের সামনে দাঁড়ায়। জীবটি মানুষের মতো দেখতে তবে হুবহু মানুষের মতো নয়। ওর মাথায় কোনো চুল নেই, শরীরের কোথাও কোনো লোম নেই। চেহারা না-পুরুষ না-নারী অর্থাৎ উভয়লিঙ্গ জাতীয়। মাথাটা একটু বড়ো আকৃতির।

ওকে দেখিয়ে পিটার বলে, এ হলো মানবোত্তর প্রজাতি অর্থাৎ মানুষের বিবর্তনের পরের ধাপ; যা আমি রিসার্চ করে সৃষ্টি করেছি। হয়ত কোটি বছর পরে এক পর্যায়ে এমন এক প্রজাতির সৃষ্টি হবে। এরা হবে না-পুরুষ না-নারী অর্থাৎ উভয়লিঙ্গ। তাদের মাথায় কোনো চুল থাকবে না; কারণ অপ্রয়োজনীয় জিনিস কালের বিবর্তনে বিলুপ্ত হয়ে যায়। যেমন মানুষের পূর্বপুরুষের লেজ ছিল কিন্তু মানুষের নেই।

স্বনন অবাক হয়ে পিটারের কথা শুনছিল।

–বুঝেছি। স্বনন একটু থেমে বলে, পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা কি তোমার এমন অভিনব আবিষ্কারের কথা জানে?

–না। এখনো জানায়নি। নিরিবিলিতে আগে গবেষণা করে দেখছি ফলাফল কী হয়। হয়ত এক সময় জানতে পারবে।

–তোমার এমন অভিনব আবিষ্কার দেখে খুব ভালো লাগল, এবার বিদায় নিতে হয় ফ্রেন্ড।

–হ্যাঁ। আমার ড্রাইভার তোমাকে বনভূমির শেষ প্রান্তে পৌঁছে দেবে।

পিটার স্বননকে নিয়ে রুম থেকে বের হয়ে যায়। বাইরে গিয়ে ওকে একটি জিপে তুলে দেয়। জিপটি বনের রাস্তা ধরে চলতে থাকে।

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

৫

স্বননকে ফিরে পেয়ে বন্ধুরা আনন্দে মেতে ওঠে। ওরা ভেবেছিল ওর হয়ত কোনো বিপদ ঘটেছে। টমসন বলে, তোমার জন্য বনভোজনটাই মাটি হয়ে গেল। কোনো আনন্দই হলো না।

জর্জ বলে, এখানে কোনো মোবাইল নেটওয়ার্ক নেই যে তোমার সাথে যোগাযোগ করব। আশেপাশে কত খুঁজলাম আমরা। এত রাত করলে কেন তুমি?

–তুমি কি কোনো বিপদে পড়েছিলে? টমাস বলে।

–একসঙ্গে এত প্রশ্ন করলে কার কথার উত্তর দেবো। বলছি সব ধীরে ধীরে। আগে গাড়িতে বসতে দাও।

–হ্যাঁ চলো এবার ফেরা যাক, অনেক রাত হয়ে গেছে। যেতে যেতে সব শোনা যাবে। টমসন বলে।

জর্জ ও টমাস গাড়িতেই বসেছিল। স্বনন ও টমসন ওদের পিছনের সিটে বসে পড়ে। টমসন ড্রাইভারকে ইশারা করতেই গাড়ি চলতে শুরু করে।

–এখন বলো বন্ধু, তুমি কোথায় গিয়েছিলে? পাশ থেকে টমসন বলে।

–আসলে হারিয়ে গিয়েছিলাম। হারিয়ে গিয়ে ভালোই হয়েছে, কাকতালীয়ভাবে এক পুরাতন বন্ধুর সাথে দেখা।

–কে সে?

–পিটার।

–পিটার!

–অবাক হচ্ছো কেন? পিটারের কথা মনে নেই; ওই যে আমাদের সাথে কলেজে পড়ত– ক্লাসের সেকেন্ড বয় ছিল।

–হ্যাঁ মনে আছে। কিন্তু পিটারের দেখা পাবে কীভাবে?

ইতোমধ্যে জংলিরা তীর তাক করে এক পা-দুপা করে স্বননের দিকে এগিয়ে আসছে। কাছে এসে ওরা স্বননকে বৃত্তাকার হয়ে ঘিরে ফেলে। স্বনন বুঝতে পারে ওরা ওকে বন্দি করবে। এদের হাত থেকে পালানোর কোনো পথ নেই। স্বনন ভাগ্যের উপর ছেড়ে দেয় নিজেকে। দেখা যাক কী করে ওরা?

–কেন, ও কী আফ্রিকায় আসতে পারে না? ও অনেক দিন ধরেই এখানে বসবাস করছে।

–শুনেছি ও আফ্রিকায় এসে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করে। কিন্তু কয়েক বছর পর রোড অ্যাক্সিডেন্টে মারা যায়।...

–কী বললে! কবে?

–তা প্রায় ৫/৬ বছর তো হবেই। তবে শুনেছি ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করার পর কিছুদিন গবেষণায় রত ছিল।

–কিন্তু ওর সঙ্গেই তো আমি দেখা করে এলাম।

কথাবার্তা বলে এলাম। শুধু তাই নয়, ও ঘুরে ঘুরে ওর অভিনব সব আবিষ্কারও দেখিয়েছে আমাকে।

–কী বলছ এসব!

–ও যদি সত্যি মারা যায় তবে কাকে দেখলাম আমি?

–সত্যি কি না শোনো ওদের কাছে। টমসন জর্জ ও টমাসকে দেখিয়ে বলে।

টমসনের কথা শুনে জর্জ ঘাড় ঘুরিয়ে বলে, পিটারের সৎকারের সময় আমি কঙ্গোতেই ছিলাম। ও খুব মেধাবী ছিল। বিভিন্ন রিসার্চে খুব নাম করেছিল ও। বিশেষ করে ক্লোন প্রযুক্তিতে ওর সুনাম ছড়িয়ে পড়েছিল অল্পদিনেই।

স্বনন জর্জের কথার কোনো জবাব না দিয়ে ভাবতে থাকে– তাহলে কি পিটার বেঁচে থাকতেই নিজের ক্লোন তৈরি করে গিয়েছিল? যাতে ওর অনুপস্থিতিতে ওর গবেষণার কোনোরূপ বিঘ্ন না ঘটে। কি জানি, হলে হতেও পারে। এই অত্যাধুনিক বিজ্ঞানের যুগে কোনো কিছুই অসম্ভব নয়।

ওদের কথা শেষ হতে না হতেই জিপটি শহরের বাংলোতে এসে পৌঁছে। ■

লেখক: গবেষক ও গল্পকার

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

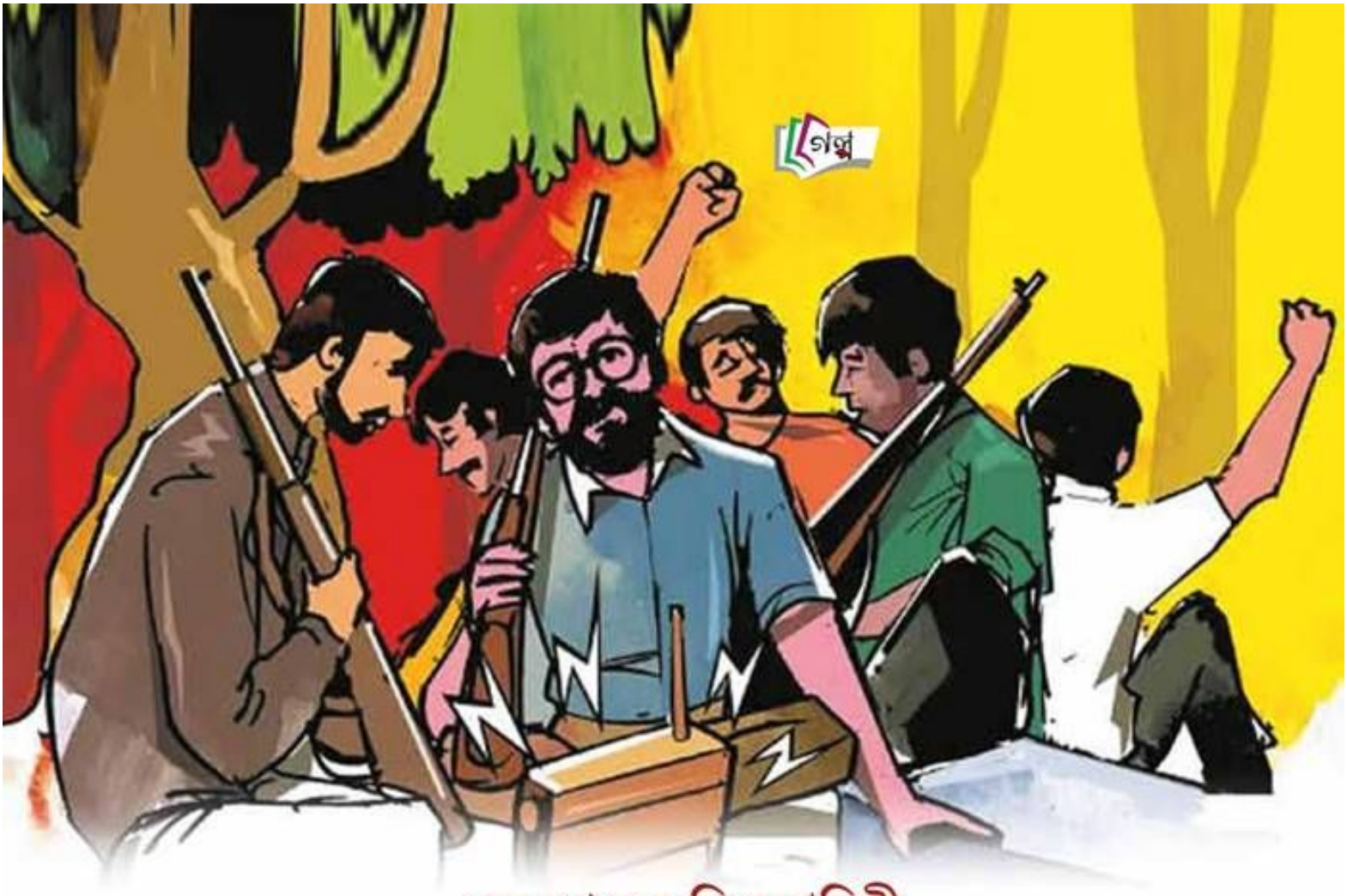

রতনপুরের বিচ্ছুবাহিনী

মুস্তাফা মাসুদ

[একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধ বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ ঘটনা: মহাকাব্যের এক মহাকাহিনি। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাঙালিদের অধিকার আদায়ের যে সংগ্রাম শুরু হয়, তারই চূড়ান্ত পরিণতি এই মুক্তিযুদ্ধ। ত্রিশ লক্ষ তাজা প্রাণ আর অসংখ্য মানুষের অবর্ণনীয় ত্যাগের বিনিময়ে আমরা লাভ করি একটি নিজস্ব ভূখণ্ড– স্বাধীন বাংলাদেশ। এই যুদ্ধে ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে এদেশের অগণিত নারী-পুরুষ– কৃষক-শ্রমিক-ছাত্র-যুবক, এমনকি কিশোর-তরুণেরাও অংশগ্রহণ করে। তাদের একমাত্র পণ ছিল বাংলার মাটি থেকে পাকিস্তানি হানাদারদের তাড়িয়ে দেশ স্বাধীন করা। তাদের সে-সংকল্প পূর্ণ হয়েছিল দীর্ঘ নয় মাসের রক্তাক্ত মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে। 'রতনপুরের বিচ্ছুবাহিনী' সেই যুদ্ধ-সংগ্রামেরই এক খণ্ডচিত্র, যেখানে বড়োদের পাশাপাশি কিশোর-তরুণেরাও সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, অনেকে শহিদ হয়েছেন। 'রতনপুরের বিচ্ছুবাহিনী' কিশোর উপন্যাসটি মহান মুক্তিযুদ্ধ ও বীর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি আমাদের আজকের শিশু-কিশোর-তরুণদের আগ্রহ ও শ্রদ্ধাবোধ জাগাবে; তাদের দেশাত্মবোধে উজ্জীবিত করবে।]

প্রথম পর্ব

জুম্মার দিনে হানাদারের চ্যালারা

আমার দাদু একজন মুক্তিযোদ্ধা, এতে আমার গর্বের শেষ নেই। সবার কাছে তাঁর এ পরিচয়টা দিতে আমার খুবই ভালো লাগে। খুশি লাগে। আনন্দ আর গর্বে বুক ফুলে ওঠে। তাঁকে সব সময় আমার কাছে রূপকথার রাজপুত্র বলে মনে হয়; যে রাজপুত্র ঘোড়ার বদলে পায়ে হেঁটে, কখনো বনজঙ্গল-কাদাপানি ভেঙে স্বাধীনতার শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করেছেন। রূপকথার রাজপুত্রের মতো তরবারি দিয়ে নয়, তিনি যুদ্ধ করেছিলেন রাইফেল- গ্রেনেড-বোমা আর ডিনামাইট নিয়ে। তারপরেও তিনি আমার কাছে অচিন দেশের স্বপ্নের রাজপুত্র– রূপকথার রাজপুত্রের চেয়েও সাহসী আর শক্তিমান।

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

দাদু একাকী বাড়িতে থাকেন। এই গ্রাম এবং আশপাশের গ্রামে তাঁর কয়েকজন সহযোদ্ধা এখনো বেঁচে থাকলেও তাঁদের সাথে দেখাসাক্ষাৎ হয় কম। সবাই যেন যার যার ঘরসংসার, জীবনযাপন নিয়েই ব্যস্ত। যুদ্ধের সেই দিনগুলোর স্মৃতি নিয়ে তাঁদের সাথে আলাপ তেমন জমে না। নিজের ছেলে আর ভাইপোরাও ব্যস্ত নানান কাজে। তাদের সাথে কথা বলার ফুরসতই পাওয়া যায় না। মুক্তিযুদ্ধ এখন যেন তাঁদের কাছে কেবলই এক ধূসর কাহিনি। দূরের ইতিহাস। তাই দাদুর বেশিরভাগ সময় কাটে বই পড়ে। বিকেলে একটু হাঁটাহাঁটি; মাঝে মাঝে উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড কাউন্সিলের বৈঠকে সভাপতিত্ব করতে যাওয়া। এটুকুতে তাঁর মন ভরে না। তাঁর কেবলই মনে হয়, সেই কথাগুলো তো ইতিহাসের উপাদান। এই ইতিহাস সবার সামনে উজাড় করে দিতে না পারলে তিনি শান্তি পান না।

দাদুর এই একাকিত্ব আর মনের অবস্থা আমি গভীরভাবে অনুভব করি। তাই মাঝে মাঝে তাঁর সাথে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে দু-চারটে কথা বলি। এতে দাদু খুশি হন, কিন্তু এতে তাঁর মন ভরে না। তাঁর বুকের মাঝে যে ঝড় তুমুলভাবে আছড়ে পড়ছে, সেই ঝড়কে তিনি মুক্তি দিতে চান বলেই আমার মনে হয়। তাই এক বিকেলে বন্ধুদের সাথে করে এনে দাদুকে চেপে ধরি মুক্তিযুদ্ধে তাঁর অংশগ্রহণ এবং তাঁর লড়াইয়ের পুরো গল্প বলার জন্য। 'গল্প' শব্দটি শুনেই দাদু বিরক্ত হন, বলেন– গল্প না; বলো সত্য কাহিনি বা সত্য ঘটনা। তবে সে গল্প গল্পের চেয়েও আশ্চর্য আর লোমহর্ষক। তবে তোমরা যে সেই কাহিনি শোনার জন্য দলবেধে এসেছ, তাতে আমি খুব খুশি হয়েছি। এবার হয়ত নিজেকে ভারমুক্ত করার একটা সুযোগ পাব।

হঠাৎ দাদুর কথার মাঝে ফোড়ন কাটে ইশতি, মানে ক্লাস এইটের 'পণ্ডিত' ইশতিয়াক বাবু– কেউ কেউ তো মুক্তিযুদ্ধকে বলে 'গোলমাল' আর মুক্তিযুদ্ধের সময়কে বলে 'গোলমালের বছর', তাই না দাদু? কিন্তু আমরা তো জানি একাত্তরের সময়টা ছিল আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের বছর– গোলমালের বছর নয়; আর মুক্তিযুদ্ধও 'গোলমাল' ছিল না । ঠিক কি না, দাদু?

ইশতির কথায় আমি তেড়ে উঠি– এই দেখো, কীসের মধ্যে কী, পান্তা ভাতে ঘি! দাদু বলছেন এক প্রসঙ্গে আর উনি এলেন পণ্ডিতি ফলাতে!

আমার আক্রমণে ইশতি চুপসে গেলেও দাদু কথা বলেন তার পক্ষে: না শুভ দাদু, ইশতি দাদুর কথা একেবারে 'পান্তা ভাতে ঘি' না। প্রসঙ্গটা একটু ভিন্ন হলেও একেবারে সিলেবাসের বাইরে নয়। সেই সিলেবাস হলো আমাদের মুক্তিযুদ্ধ। ওর কথাটিও খুব গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের মুক্তিযুদ্ধ যে ফালতু গোলমাল ছিল না– ছিল ন্যায়ের সংগ্রাম; মুক্তি ও স্বাধীনতার জন্য মরণপণ লড়াই– সেটি সব সময় সবাইকে মনে রাখতে হবে। এ পর্যন্ত বলেই দাদু হাঁক দিলেন– জরিনার মা, এখনো চা দিলে না?

মুহূর্তে জরিনার মা চা-বিস্কুট আর পানির গ্লাসসহ ট্রে নিয়ে বসার ঘরে হাজির। পান-রাঙানো ঠোঁটে একরাশ হাসি ছড়িয়ে বলে– এই তো খালুজান, আইসে পড়িছি। দরজার কাছে দাঁড়ায়ে ছিলাম, আপনার কথা শুনতিছিলাম। এই নেন চা-নাশতা। তয় এট্টা কথা– আজ আমিও থাকপ আপনার আসরে। আমার খুব ইচ্ছে করে যুদ্ধের কথা শুনতি। আপনি তো জানেন খালুজান, আমার বাজানও ছিল একজন মুক্তিসেনা। কিন্তু সে তো ফিরে আসল না... কান্নায় ভেঙে পড়ে জরিনার মা। দাদু তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন– আহা, কাঁদে না বাপু। তোমার বাপ মহান মুক্তিযুদ্ধে শহিদ হয়েছেন, এটা তোমার জন্য গর্বের না, আচ্ছা ঠিক আছে, তুমিও থাকবে। আজ পুরো বিকেল তোমার ছুটি।

জরিনার মা'র কারণে দাদুর গল্প শুরু করতে দেরি হচ্ছে দেখে আমরা ভেতরে ভেতরে বিরক্ত হচ্ছি। কিন্তু কিছু বলছি না কারণ কোন উটকো ঝামেলায় পড়ে যাই সেই ভয়ে। দাদু ঝটপট চা খেয়েই আমাদের সবার দিকে একবার চোখ বোলালেন। আমরা সে চোখ দেখে চমকে উঠি, সেই বিশেষ চোখ– দুই চোখ যেন আগুনের গোলক। হাত দুটো থরথর করে কাঁপছে রাগে নাকি উত্তেজনায়, বোঝা যায় না। হঠাৎ দাদু মুখ খোলেন। গম্ভীর কণ্ঠস্বর– যেন অচেনা কেউ একজন আমাদের সামনে কথা বলছে।

সেদিন ছিল শুক্রবার– উনিশ'শ একাত্তর সাল। তারিখটা মনে নেই, তবে জুন মাসের প্রথম সপ্তাহের জুম্মার দিন, তা স্পষ্ট মনে আছে। আমি তখন বাঘারপাড়া হাই স্কুলের ক্লাস টেনের ছাত্র। সেই শুক্রবার বাবার সাথে জুম্মার নামাজ পড়তে গিয়েছি মসজিদে। গ্রামের আরো পনেরো-বিশজন মানুষ এসেছে নামাজ পড়তে। অন্য সময় যেখানে প্রায় শ

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

খানেক মুসল্লি হয়, এখন যুদ্ধের কারণে মুসল্লির সংখ্যা পনেরো-বিশে ঠেকেছে– যাদের বেশিরভাগই বয়স্ক মানুষ। কখন পাকিস্তানি হানাদার সৈন্যরা আর বেইমান রাজাকারেরা হামলা চালায়, সেই ভয়ে বেশিরভাগ মানুষ গ্রাম ছেড়েছে। তরুণ-যুবকেরা অনেকেই মুক্তিযুদ্ধে চলে গেছে– আমার বয়েসি কয়েকজনও গেছে। আমিও যাব। কিন্তু সমস্যা হলো মাকে নিয়ে। আমি বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান। মা'র কান্নাকাটি দেখে আমি একটু দমে যাই। তাই আজ-কাল করতে করতে এ পর্যন্ত দেরি করে ফেলেছি। অবশেষে মা রাজি হন। বাবা তাকে বোঝান যে, রাজাকার আর পাকিস্তানি মিলিটারিরা জোয়ান ছেলেদের মুক্তিবাহিনীর লোক মনে করে গুলি করে মারছে। এ সময় ও বাড়ি থাকলে ওদের হাতে মারা পড়বে। তার চেয়ে ও মুক্তিযুদ্ধে যাক। মরলে দেশের জন্য লড়াই করে মরুক; বিড়ালের মতো ঘরের মধ্যে আটক থেকে মরা কেন? বাবার কথায় মা বলেন- তাই তো! এতদিন আমি একি ভুল করেছি! এখন দেশের ঘোর দুর্দিন। এ সময় ওরা যুদ্ধ না করলে দেশ স্বাধীন হবে কীভাবে? আমরা বাঁচব কীভাবে?

মায়ের কথা শুনে বাবা তাকে ধন্যবাদ দিয়ে বলেন– শাবাশ, বাবুর মা! মুক্তিযোদ্ধার মায়ের মতোই কথা! আমি আনন্দে মাকে জড়িয়ে ধরে বলেছিলাম– মা, তুমি দোয়া করো যেন দেশ স্বাধীন করেই ফিরতে পারি। এরপর আর কোনো সমস্যা থাকল না। সব গোছগাছ শেষ। ঠিক হলো– আগামী সোমবার রাতে এই গ্রামের মুক্তিযোদ্ধা সেলিম ভাই আসবেন। তার সাথে আমি এবং অন্য পাঁচজন যুদ্ধে যাব।

তো, যা বলছিলাম– আমরা জুম্মার চার রাকাত সুন্নত নামাজ পড়ে বসে আছি। ইমাম সাহেব জুম্মার খুতবার জন্য দাঁড়াবেন, এমন সময় সাত/আটজন রাজাকার, কেউ রাইফেল কাঁধে কেউ মোটা লাঠি হাতে মসজিদে ঢোকে।

আচ্ছা দাদুরা, এখানে একটা কথা- রাজাকার সম্পর্কে তোমাদের কী কোনো ধারণা আছে?

দাদুর প্রশ্নে আমরা আমতা আমতা করতে থাকি– হ্যাঁ...না...ইয়ে... তখন দাদু বললেন– ওদের সম্পর্কে তোমাদের ধারণা নেই বুঝতে পারছি। আমি বলছি শোনো– সাধারণভাবে রাজাকার শব্দটির মানে হলো স্বেচ্ছাসেবক। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের সময় রাজাকারেরা এই শব্দটির অর্থই বিকৃত করে ফেলে। কারণ, একাত্তরে রাজাকারেরা সাধারণ স্বেচ্ছাসেবক ছিল না। ওরা ছিল বাঙালি, কিন্তু হানাদার পাকিস্তান বাহিনীর সহযোগী। ওদের হাতে অস্ত্রও তুলে দেওয়া হয়েছিল। ওরা নিজেরা যেমন নিরপরাধ মুক্তিকামী বাঙালিদের হত্যা করেছে, তাদের বাড়িঘর-সহায়সম্পদ লুট করেছে, তেমনি হত্যা-লুটপাট-ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিতে হানাদারদের সহযোগীও হয়েছিল। এখন তাই এই শব্দটিকে কেউ 'স্বেচ্ছাসেবক' অর্থে ব্যবহার করে না– এটি এখন ব্যবহৃত হয় একটা গালি হিসেবে; যেমন– মীর জাফর শব্দটি বিশ্বাসঘাতক হিসেবে চালু হয়ে গেছে।

যাক সে কথা। মসজিদে আসা রাজাকারদের একজন হাঁক দিয়ে কয়– ইমাম সাব, এই মসজিদে 'মুক্তি' আছে। আপনি একটু বসেন, আমরা এখনি যাচাই করে দেখব তারপর আপনি নামাজ পড়াবেন। এ কথা বলেই তারা সবার দিকে বারকয়েক তাকায়। তারপর আমার কাছে এসে জিজ্ঞেস করে– নাম কী তোমার?

– মোহাম্মদ সোহানুর রহমান বাবু।

আমার ডাকনাম 'বাবু' শুনেই রাজাকারেরা ভয়ানকভাবে চেঁচিয়ে ওঠে– কী বললে, বাবু? এ তো হিন্দুদের নাম– হিন্দু বাবু! নাউজুবিল্লাহ নাউজুবিল্লাহ! বলতে বলতে একজন রাইফেলের বাঁট দিয়ে আমার মাথায় বাড়ি মারে। আমি কাত হয়ে পড়ে যাই। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছোটে। সাথে সাথে বাবা চিৎকার করে বলেন– এ তোমরা কী করলে, বাবারা! ও তো আমার ছেলে। ও মসজিদে এসেছে নামাজ পড়তে। হিন্দুর ছেলে কী নামাজ পড়তে আসে!

ওরা বাবাকেও ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়। গজগজ করে বলে: ব্যাটা মালাউনকা বাচ্চা মালাউন! স্রেফ হিন্দু আর মুক্তি। আবার বলে নামাজ পড়তে এসেছে! সব ঝুটা হ্যায়– স্রেফ ঝুটা।... শেষমেষ আমাকে এবং আমার চেয়ে ছোটো আরো দুজনকে ওরা দুই হাত পিছমোড়া দিয়ে বেঁধে নিয়ে চলল ওদের ক্যাম্পের দিকে। আমার বাবা এবং ওই ছেলে দুটোর বাবারা হাউমাউ করতে করতে পিছু পিছু আসছিলেন। তা দেখে রাজাকারেরা কয়েকটা ফাঁকাগুলি ছোড়ে আর চিৎকার করে শাসায়– হট যাও! আর আগ বাড়ালেই গুলি করে মারব। ভাগ ব্যাটারা, ভাগ! ■

লেখক: শিশু সাহিত্যিক ও ঔপন্যাসিক

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

ঝুড়ি পাকা আম

সারমিন ইসলাম রত্না

আমি একটি আম, এখনও বেশ কাঁচা। তার মানে এই নয় যে আমি এখনও অনেক ছোটো। বড়ো হয়েছি। মায়ের কাছ থেকে শুনেছি আমাদের অনেক গুণাগুণ। যেমন কাঁচা থাকলেও তেমন পেকে গেলেও। কাঁচা আম দিয়ে অনেক কিছু তৈরি করা যায়, পাকা আম দিয়েও যায়। এই যেমন-কাঁচা আমের শরবত, কাঁচা আমের ডাল, কাঁচা আমের নানা রকমের আচার, মুখরোচক ভর্তা। আর পাকা আম দিয়ে তৈরি করা যায় মজাদার জুস, আইসক্রিম, চকলেট এবং জেলি। ইশ! জিভে জল এসে গেল। তাই তো মানুষ আম খেতে খুব ভালোবাসে। আম বছরে মাত্র কয়েক মাসের জন্যই আসে। চৈত্র-বৈশাখ মাসে আমের মুকুল ফোটে, মধুমাসে আম পেকে যায়। মানুষ করে কী আরো আগে থেকে পাকা আম খাওয়ার জন্য আমগুলোকে গাছ থেকে পেড়ে ওষুধ দিয়ে পাকায়। তারপর সেটাতে ফরমালিন দিয়ে রাখে। দয়া করে তোমরা এটা করো না, এটা শরীরের জন্য খুবই ক্ষতিকর। আমি কারো ক্ষতির কারণ হতে চাই না। তোমাদের যেমন লেখাপড়া করে মানুষের মতো মানুষ হতে মন চায়, আমারো তেমন গাছে গাছে ঝুলে ঝুলে পেকে পেকে রসালো আম হতে মন চায়। আমে রয়েছে নানারকমের ভিটামিন, বিশেষ করে ভিটামিন 'এ' -যা তোমাদের চোখের জন্য খুবই উপকারী। আমি একা একা কথা বলছি দেখে ছোটো-বড়ো সব আমও এসে যোগ দেয়। একটি আম বলল, শাবাশ! তুমি খুব ভালো কথা বলেছ। আরেকটি আম বলল, আমাদের ব্যাপারে মানুষকে সচেতন করা দরকার। ছোটো ছোটো কয়েকটি আম গাল ফুলিয়ে বুঝদারের মতো বলল, হুম। হঠাৎ ঝড় উঠল, তুমুল ঝড়। আমরা ভয় পেতে শুরু করলাম। গাছের ডালপালাগুলো থরথর করে কাঁপতে লাগল, বুকটা দুরুদুরু করতে লাগল আমাদের। একদল খোকাখুকু দৌড়ে এসে গাছের নিচে ভিড় করল আর বলতে লাগল, ঝড় এল এল ঝড়। আম পড় আম পড়। ওমা কি সর্বনাশ! ওরা আমাদের পড়ে যাওয়ার দোয়া করছে। আমরা চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করলাম। গাছের ডালপালাগুলো এমনভাবে ধরে রাখলাম যেন কিছুতেই পড়ে না যাই। ওদিকে আকাশ কালো করে ঝড় বাড়তে লাগল আর বাড়তেই লাগল। ধাপ ধুপ ধপাস, সবগুলো আম পড়ে গেল মাটিতে। খোকা খুকুরা হইচই করতে করতে আমগুলো তুলে নিলো।

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

লাল টুকটুকে জামা পরা একটি মেয়ে তুলে নিলো বড়োসড়ো সেই কাঁচা আমটি। তারপর দৌড়ে গেল মায়ের কাছে। মা, মা দেখো দেখো কত বড়ো একটি আম পেয়েছি। তবে আমটি এখনো পাকেনি। ওকে ঝুড়িতে রেখে দাও, পেকে গেলে তারপরেই খাব। অনেক ওপর থেকে পড়ে যাওয়ার কারণে আমটি চোখে সব ঘোলা ঘোলা দেখছিল। মেয়েটির কথা শুনে সে ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হলো। এদিক-ওদিক তাকালো, ওকে রাখা হয়েছে নীল রঙের একটি ঝুড়িতে। ঝুড়িটা দেখতে বেশ ভালো, ছোটো ছোটো ফুটো রয়েছে, বাতাস আসা যাওয়া করে। আমটি বুক ভরে শ্বাস নিলো। তারপর আরাম করে বসে মনে মনে ভাবতে লাগল গাছ পাকা আম না হতে পারি ঝুড়ি পাকা আম তো হতে পারব। মানুষের ক্ষতির কারণ থেকে তো বাঁচতে পারব। তাহলে ঝড়ে আমাদের পড়ে যাওয়ার পেছনেও একটা উপকার রয়েছে। ■

লেখক: শিশু সাহিত্যিক

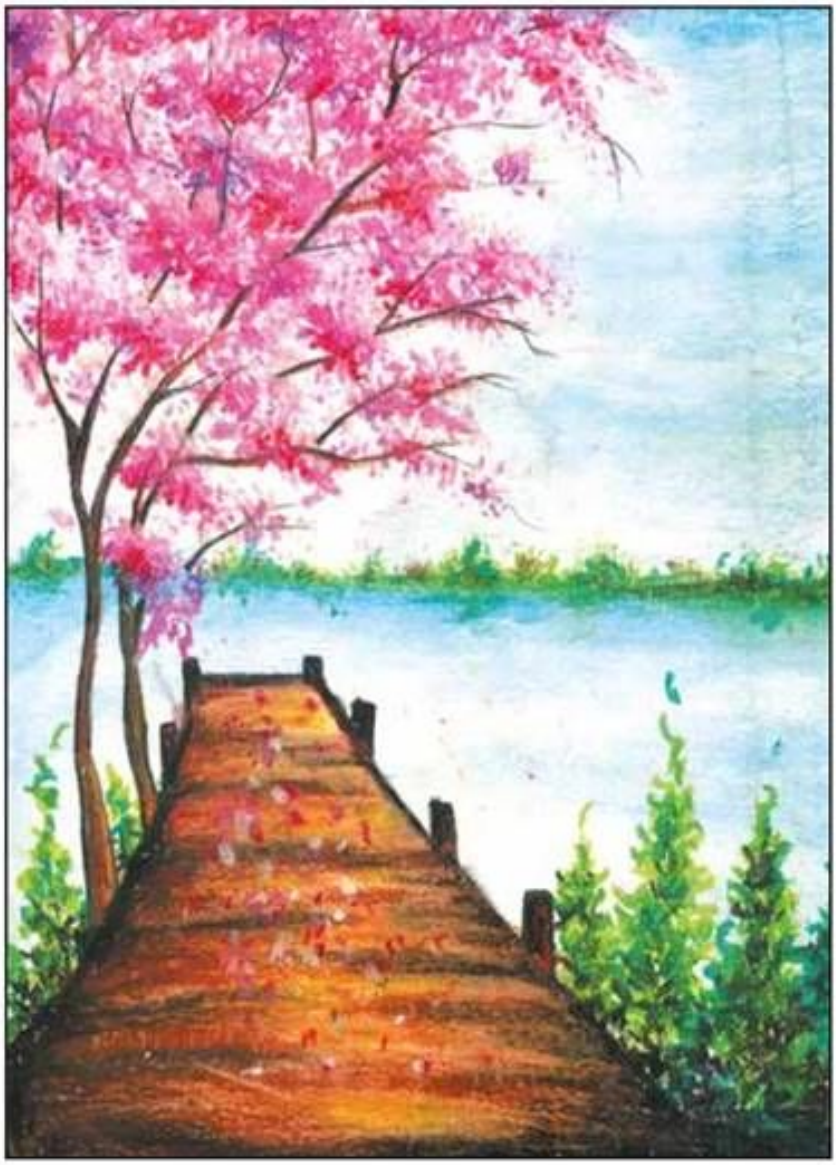

সায়মা আনজুম বিভা, ৯ম শ্রেণি, আইডিয়াল প্রিপারেটরী অ্যান্ড হাই স্কুল, শেরপুর

আম

মো. মিহির হোসেন

ফলের রাজা আম খেতে
লাগে মজা বেশ
হরেক নামের এ ফলেতে
রসের নাই যে শেষ।

এক গাছে অনেক ফল
থোকায় থোকায় ধরা।
মজার ফলে আছে অনেক
পুষ্টিগুণে ভরা।

৬ষ্ঠ শ্রেণি
মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

গল্প

ভাষা-দাদুর সঙ্গে ঞ এবং অন্যান্য যুক্তবর্ণ

তারিক মনজুর

নেহার ছোটো ভাই নাবি খাতায় বড়ো করে একটা 'ঞ' এঁকে জিজ্ঞেস করল, 'আপু, তুমি বলতে পারবে, এখানে কোন কোন বর্ণ আছে?'

নেহা খাতায় আঁকা ঞ-র দিকে তাকিয়ে বলল, 'এখানে আছে মূর্ধন্য-ষ আর মূর্ধন্য-ণ।'

নাবি বলল, 'কিন্তু আমার মনে হয়, এখানে আছে মূর্ধন্য-ষ আর ঞ।'

'দেখতে অবশ্য ঞ-র মতোই লাগছে!' খানিক দ্বিধা নিয়ে নেহা ওর ভাইয়ের দিকে তাকালো। তারপর বলল, 'তবে আমি তো জানি এটা মূর্ধন্য-ণ।'

'মূর্ধন্য-ণ হলে দেখতে ঞ-র মতো হবে কেন?' নাবি প্রশ্ন করে।

'তাহলে এক কাজ করি! ভাষা-দাদুকে বাড়িতে আসতে বলি।' নেহা প্রস্তাব করে।

ভাষা-দাদু কঠিন বিষয়কেও অনেক সহজ করে বুঝিয়ে দেন। তাই নাবিও মাথা ঝাঁকিয়ে হ্যাঁ হ্যাঁ করল। নেহা ফোন করে ভাষা-দাদুকে আসতে বলল বাড়িতে। সন্ধ্যার সময় ভাষা-দাদুর কোনো কাজ

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

থাকে না। তিনি নেহাদের পাশের বাড়িতেই থাকেন। ফলে ফোন পেয়ে দ্রুত চলে এলেন।

'কী সমস্যা শুনি!' বসতে বসতে বললেন। এরপর হাতের লাঠিটা একপাশে দাঁড় করিয়ে তার ওপর টুপিটাও কায়দা করে রাখলেন।

'দেখো তো দাদু, এটা।' ষ্ণ যুক্তবর্ণ দেখিয়ে নাবি বলল, 'আপু বলছে এখানে নাকি মূর্ধন্য-ষ আর মূর্ধন্য-ণ আছে। মূর্ধন্য-ণ যদি থাকবে, তবে দেখতে ঞ-র মতো হবে কেন?'

ভাষা-দাদু বললেন, 'বাংলা ভাষায় অনেক কঠিন যুক্তবর্ণ আছে। তবে ষ্ণ সবচেয়ে বিভ্রান্ত করে। দেখে মনে হয় এখানে ঞ আছে। আসলে এখানে আছে মূর্ধন্য-ণ।'

'তাহলে, দাদু, দেখতে ঞ-র মতো লাগছে কেন?' নাবি আবার প্রশ্ন করে।

'মধ্যযুগে বইপত্র সব হাতে লেখা হতো। তখন কোনো ছাপাখানা ছিল না। মধ্যযুগের প্রথম দিকে মূর্ধন্য-ষ আর মূর্ধন্য-ণ পাশাপাশি যুক্ত হয়ে বসতো এভাবে: ষণ। এরপর হাতের লেখার সুবিধায় মূর্ধন্য ণ-এর আকৃতি প্যাঁচ খেয়ে ঞ-র মতো হতে থাকে। মধ্যযুগের শেষ দিকে ষণ-এর চেহারা হয়ে যায় ষ্ণ।' ভাষা-দাদু কাগজ-কলম নিয়ে ষণ-এর বিবর্তনের ধারা এঁকে এঁকে দেখালেন।

খুব অবাক হয়ে নেহা এটা দেখছিল। সে বলল, 'দাদু, হ আর ম মিলে হয় হ্ম। এ দুটি বর্ণ একটানে লিখলে অনেকটা হ্ম-এর মতো দেখায়। এই যুক্তাক্ষরও মনে হয় হাতের লেখার সুবিধায় একসঙ্গে প্যাঁচ খেয়ে এ রকম হয়েছে।' এই বলে নেহা আলাদা আলাদা করে হ আর ম লিখে দেখালো। তারপর একটানে হ আর ম লিখল। নাবি দেখল, হ আর ম একসঙ্গে লেখার কারণে হ্ম-এর মতোই প্রায় দেখাচ্ছে।

দাদু বললেন, 'হাতের লেখার সুবিধার জন্যই যুক্তবর্ণ বিভিন্ন রকম চেহারা পেয়েছে। যেমন, ক আর ত মিলে ক্ত হয়েছে। ঙ আর গ মিলে ঙ্গ হয়েছে। ন আর ধ মিলে ন্ধ হয়েছে। যদিও এসব যুক্তবর্ণ এখন সব ক্ষেত্রে স্বচ্ছ বা স্পষ্ট করে লিখতে বলা হচ্ছে।'

'আচ্ছা দাদু, এ রকম যুক্তবর্ণের সংখ্যা মোট কতটি হবে?' দাদুর কথার মাঝখানে নাবি প্রশ্ন করে।

ভাষা-দাদু বললেন, 'প্রায় চারশোর মতো যুক্তবর্ণ রয়েছে। তবে, যুক্তবর্ণ সংখ্যা গোনার আগে যুক্তবর্ণের সংজ্ঞা ঠিক করা জরুরি।'

'যুক্তবর্ণের সংজ্ঞা!' নেহা বেশ অবাক হয়।

'হ্যাঁ, সংজ্ঞা। যেমন– দুটি ব্যঞ্জনবর্ণ একসঙ্গে যুক্ত হয়ে যুক্তবর্ণ গঠিত হয়। তিনটি যুক্তবর্ণ যুক্ত হয়েও তো যুক্তবর্ণ গঠিত হতে পারে।'

'তিনটি!' এবার নাবির অবাক হওয়ার পালা।

ভাষা-দাদু বলতে থাকেন, 'যেমন– উজ্জ্বল শব্দের যুক্তবর্ণে তিনটি বর্ণ রয়েছে। জ, জ, ব মিলে এখানে জ্জ্ব তৈরি হয়েছে। কিংবা ধরো, স্বাস্থ্য শব্দের শেষে স, থ, য মিলে স্থ্য তৈরি হয়েছে।...তবে সংজ্ঞায়ন বলতে আমি আরো কিছু বোঝাচ্ছি। যুক্তবর্ণে ব্যঞ্জনের সঙ্গে ব্যঞ্জন যুক্ত হয়। তবে, ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে স্বরবর্ণ যুক্ত হলে তাকে যুক্তবর্ণ বলা হবে কি না, এটাও সংজ্ঞায় নির্দিষ্ট করতে হবে।'

'মানে?' নাবি প্রশ্ন করে।

'মানে, ক আর ত মিলে হয় ক্ত। কিন্তু ক-এর সঙ্গে উ যোগ হলে তাকে যুক্তবর্ণ বলা যাবে কি না।' দাদু ব্যাপারটাকে সহজ করেন।

'ক-এর সাথে উ মিলে কু হয়। ম-এর সাথে আ মিলে মা হয়। দ-এর সাথে এ যুক্ত হয়ে দে হয়। এগুলো আবার যুক্তবর্ণ নাকি?' নেহা প্রশ্ন করে।

'কিন্তু অনেক ব্যাকরণবিদ এসব কার চিহ্নযুক্ত শব্দকেও যুক্তবর্ণ বলেছেন। কার চিহ্নকে যুক্তবর্ণের মধ্যে ধরলে যুক্তবর্ণের সংখ্যা আটশ ছাড়িয়ে যাবে।' ভাষা-দাদু নেহার দিকে তাকিয়ে বলেন।

'ওরে, বাবা! এত যুক্তবর্ণ মনে রাখব কীভাবে?' নাবি প্রশ্ন করে।

ভাষা-দাদু বললেন, 'বর্তমানে যুক্তবর্ণের সুবিধা হলো এগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই খুব স্পষ্ট। যেমন, স

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

আর ত মিলে ন্ত হয়। ন আর ত মিলে ন্ত হয়। তবে এগুলোর নিচে উ-কার যোগ করলে অনেক সময় চেহারা বদলে যায়।'

'উ-কার যোগ করলে চেহারা বদলে যাবে, এই নিয়ম আমি মানতে পারি না।' নেহা যোগ করে।

ভাষা-দাদু হাসেন। বলেন, 'তবে আগের দিনে উ-কারের চেহারা বিভিন্ন রকম ছিল। র-এর সাথে, গ-এর সাথে, শ-এর সাথে কিংবা হ-এর সাথে উ-কার যোগ করলে বর্ণের বিচিত্র আকার তৈরি হয়। এখনও কম্পিউটারের লেখায় ওইসব চেহারা দেখতে পাবে। তবে তোমরা হাতে লেখার সময় উ-কারকে বর্ণের নিচে পরিষ্কার করে লিখবে।'

'দাদু, কম্পিউটারে লিখলে উ-কারের এত চেহারা তৈরি হয় কেন?' নাবি প্রশ্ন করে।

ভাষা-দাদু বলেন, 'যারা টাইপ বা ফন্ট নিয়ে কাজ করেন, তাদেরকেই আসলে এটা নিয়ে ভাবতে হবে। তারা চাইলেই সব উ-কারকে বর্ণের নিচে পরিষ্কার করে দেখাতে পারেন। তখন আর উ-কার নিয়ে কোনো সমস্যা থাকে না।'

'কিন্তু, দাদু, যুক্তবর্ণ তো অনেক আছে।' নেহা বলতে থাকে, 'সব যুক্তবর্ণকে কি স্পষ্ট করে লেখা যাবে?'

ভাষা-দাদু বলেন, 'কেন যাবে না? চাইলে সব যুক্তবর্ণকেই স্বচ্ছ বা স্পষ্ট করে লেখা যাবে। তাছাড়া এখন যথাসম্ভব সব ক্ষেত্রে যুক্তবর্ণ স্বচ্ছ করে লিখতে বলা হয়েছে। ক্ত, ঙ্ক, ঙ্গ, ঙ্ঘ, ঞ্চ, দ্ধ, ন্ধ, ব্ধ ইত্যাদি সব যুক্তবর্ণকেই স্পষ্ট করে লিখতে হবে। পাঠ্যপুস্তকেও স্বচ্ছ যুক্তবর্ণ ব্যবহারের নির্দেশ রয়েছে।'

'দাদু, ক্ষ, জ্ঞ এসব যুক্তবর্ণের স্বচ্ছ রূপ কেমন হবে?'

'ক্ষ, জ্ঞ – এ রকম দু-একটা যুক্তবর্ণে শুধু সমস্যা থাকে। এগুলো নিয়ে এখনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় আসেনি। যদিও আমি কয়েকজনকে জ্ঞ-কে পরিষ্কার করে জ-এর নিচে ঞ লিখতে দেখেছি।'

যুক্তবর্ণ নিয়ে আলোচনা মোটামুটি শেষ করে ভাষা-দাদু ওঠার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। এমন সময় নাবি হাসতে হাসতে বলল, 'দাদু, এই যে তোমার লাঠি; আর লাঠির ওপরে টুপি। এই দুটা মিলেও কিন্তু যুক্তবর্ণ তৈরি করেছে!' ■

লেখক: অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

নাওশিন শারমিলি নাফসিন, ৮ম শ্রেণি, আইডিয়াল স্কুল, ঢাকা

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

গল্প

ভালো কিছু করার অসুখ

বিশ্বজিৎ দাস

'ধুপ' করে শব্দ হলো।

'কেরে?' চিৎকার করে উঠলেন রাহেলা বেগম। মিলির দাদি।

'মা, কীসের যেন শব্দ হলো'-মিলি বলল। শুয়ে আছে ও মায়ের সাথে।

দুপুর গড়িয়েছে। খেয়েদেয়ে রান্নাঘরের কাজ শেষ করে মাত্রই বিছানায় শুয়েছেন সেলিনা বেগম-মিলির মা। মেয়েকে জোর করে পাশে শুইয়ে দিয়েছেন। দিনে ঘুমাতে চায় না। তবু মিলিকে কাছ ছাড়া করেন না সেলিনা।

'মা, রান্নাঘরে কীসের যেন শব্দ হচ্ছে।' ফিসফিস করে বলল মিলি।

'ঘুমা তো এখন। খালি বকবক আর বকবক।' চোখ বুঁজে থেকেই মৃদু ধমক দিলেন তিনি।

'মা, আমি গিয়ে দেখে আসি।' ফিসফিস করে বলল মিলি।

'যা। তাড়াতাড়ি আসবি। এদিক-ওদিক যাবি না কিন্তু।'

ধীরে ধীরে বিছানা থেকে নেমে গেল মিলি। পা টিপে টিপে এগিয়ে গিয়ে উঁকি দিল রান্নাঘরে। পেছন ফিরে রয়েছে এক লোক।

'কী করছ বাবা?'

জবাবে ঠোঁটে আঙুল দিয়ে ওকে চুপ করে থাকার জন্য ইশারা করল মাসুদ। মিলির বাবা।

'কী করছ বাবা?' ফিসফিস করে জানতে চাইল মিলি।

'দেখছিস না, চাল নিচ্ছি ব্যাগে। আমাকে একটু সাহায্য কর। ব্যাগটা ধর।'

'এই চাল দিয়ে তুমি কী করবে?'

'একটা পরিবারকে দেবো। গরিব পরিবার। দু-দিন ধরে না খেয়ে আছে। করোনার পর থেকে ওদের আয় একেবারে নেই বললেই চলে।'

মিলি ব্যাগ ধরল। মাসুদ ব্যাগে চাল নিল। আলু, পেঁয়াজও দিল কয়েকটা করে।

'তোর মাকে বলিস না, ক্যামন?' চালের ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে গেল মাসুদ।

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

মিলি ফিরে এসে আবার মায়ের পাশে শুয়ে পড়ল।
'তোর বাবা রান্নাঘর থেকে কী নিয়ে গেল রে?' মিলি কিছু বলার আগেই জিজ্ঞেস করলেন সেলিনা।
'চাল, আলু আর পেঁয়াজ।'
'হুম।'
'বাবা ওগুলো কোথায় নিয়ে গেল মা?'
'কে জানে। কাউকে দান করবে মনে হয়।'
'তুমি বাবাকে বকলে না যে?'
দীর্ঘশ্বাস ফেললেন সেলিনা।
'তোর বাবার একটা অসুখ আছে। সেই অসুখটা খারাপ না।'
'কী অসুখ মা?'
'মানুষের ভালো করার অসুখ। সবসময় মানুষের জন্য ভালো কিছু করতে চায়। আমি জানলে যদি কিছু বলি। তাই চুপ করে এসে চাল, আলু আর পেঁয়াজ নিয়ে গেল।'
'কাদের জন্য নিয়ে গেল মা?'
'তা তো জানি না। হয়ত খুব গরিব মানুষের দেখা পেয়েছে। তাদের জন্যই নিয়ে গেল।'
'তুমি কি বাবাকে কিছুই বলবে না?'
হেসে ফেললেন সেলিনা।
'তুই কি চাস আমি তোর বাবার সাথে রাগারাগি করি?'
'না, মা।'
'শোন মিলি, অনেকদিন একসাথে সংসার করছি তো, জানি তোর বাবা খারাপ মানুষ না। তোর বাবা মানুষকে সাহায্য করতে চায়। আমার ভয়েই তো গোপনে সাহায্য করে। এটা তোর বাবার অসুখ। মানুষের জন্য ভালো কিছু করার অসুখ। বড়ো বড়ো মানুষদের এই ধরনের অসুখ থাকে রে মা। তাই তোর বাবাকে আমি কিছু বলি না।'
'বড়ো বড়ো মানুষ? তারা আবার কারা মা?'
'তাদের কথা তুই বইতে পড়েছিস রে মা। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, মওলানা ভাসানী, শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক-এদের সবারই এই অসুখ ছিল রে মা। মানুষের উপকার করার মহান অসুখ।'
বলতে বলতে ঘুমিয়ে পড়লেন সেলিনা।
নীরবে বিছানা থেকে নামল মিলি। ধীর পায়ে এগিয়ে চলল রান্নাঘরের দিকে।
মানুষের জন্য ভালো কিছু করার অসুখ তারও যে রয়েছে! ■

লেখক: সহকারী অধ্যাপক, দিনাজপুর সরকারি কলেজ

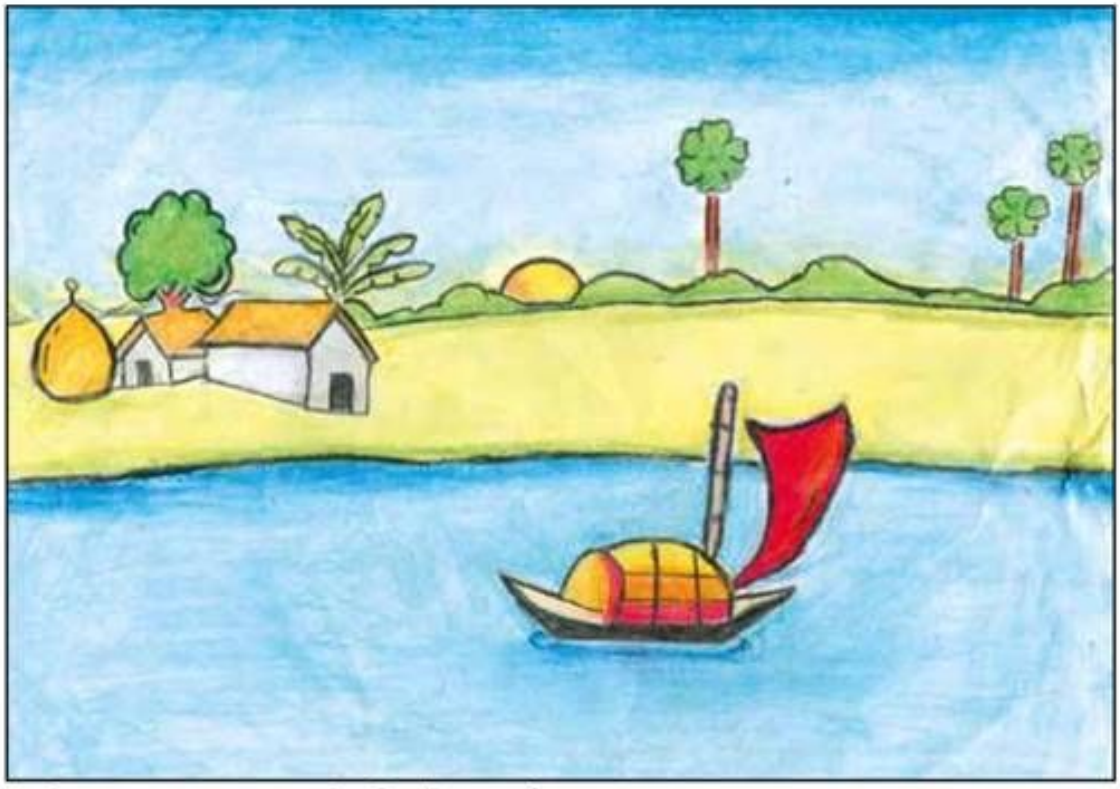

ফাতিমা তাহনান, ৫ম শ্রেণি, খিলগাঁও গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

নিবন্ধ

বজ্রপাতে ভয় নয় হবো সচেতন

তৈয়বুর রহমান

বজ্রপাত একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ। সাধারণত কিউমুলোনিম্বাস মেঘ থেকে বজ্রপাত ও বৃষ্টি হয়। তাই এই মেঘকে বজ্রমেঘও বলা হয়। একটি মেঘের সঙ্গে যখন আরেকটি মেঘের ঘর্ষণ হয় তখন বজ্রপাত হয়। এ সময় উচ্চ ভোল্টের বৈদ্যুতিক তরঙ্গ মাটিতে নেমে আসার পর সবচেয়ে কাছের জিনিসটিকেই আঘাত করে।

দক্ষিণ এশিয়ার বজ্রপাতপ্রবণ দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম বাংলাদেশ। বাংলাদেশে বিগত কয়েক বছর ধরে বজ্রপাতের তীব্রতা বেড়েছে। বিশেষ করে হাওরাঞ্চলে। এক জরিপে দেখা গেছে ২০১৩ সাল থেকে ২০ সাল পর্যন্ত দেশে প্রায় ১ হাজার ৮৭৮ জন মানুষ বজ্রপাতে মারা গেছেন। সংখ্যা শুনে ভয় পেলে চলবে না। তবে কিছু বিষয় মেনে চললে এ থেকে সুরক্ষা পাওয়া সম্ভব। বাংলাদেশের দক্ষিণ থেকে আসা গরম আর উত্তরের ঠান্ডা বাতাসে সৃষ্ট অস্থিতিশীল আবহাওয়ায় তৈরি হয় বজ্রমেঘের। বজ্রপাত বেড়ে যাওয়ার অন্যতম কারণ হলো বাতাসে জলী বাষ্পের আধিক্য। তেমনই আরেক কারণ তাপমাত্রা বৃদ্ধি। তাপমাত্রা যদি ১ ডিগ্রি বাড়ে তবে বজ্রপাতের সম্ভাবনা ৫০ ভাগ বাড়ে। এক্ষেত্রে উঁচু গাছপালা বজ্র নিরোধক হিসেবে কাজ করে। তাছাড়া বনায়ন কমে গেলে তাপমাত্রাও বৃদ্ধি পায়। আবহাওয়াবিদদের মতে বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান বজ্রপাতের অনুকূলে। এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে পৃথিবীতে প্রতি মিনিটে ৮০ লাখ বজ্রপাত সৃষ্টি হয়। এরমধ্যে ২০১৯-২০ সালে আমাদের দেশে ৩১ লাখ ৩৩ হাজারের বেশি বজ্রপাত হয়েছে। সারা বছর যে পরিমাণ বজ্রপাত হয় তার ২৬ শতাংশ হয় মে মাসে। উন্নত দেশগুলোতেও একসময় বজ্রপাতে বহু মানুষের মৃত্যু হতো। তবে তারা বজ্রনিরোধক খুঁটি বা পোল স্থাপন করে মানুষকে সচেতন করার মধ্য দিয়ে ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে এনেছে।

বজ্রপাতের সময় কেউ খোলা মাঠে বা পানির পাশে দাঁড়িয়ে থাকে তবে সমতল ভূমির তুলনায় দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটির উচ্চতা বেশি হওয়ায় সে সরাসরি বজ্রপাতের শিকার হতে পারে। এমন প্রাণহানিকে সরাসরি আঘাত বলা হয়। অন্যদিকে কেউ যদি বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি যেমন—মুঠোফোনে কথা বলে বা কম্পিউটারে কাজ করে বা টিনের ঘরে টিনের দেয়ালে হেলান দিয়ে থাকে তবে বজ্রপাত থেকে নির্গত অতিরিক্ত ভোল্টেজের সংস্পর্শে সে মৃত্যুবরণ করতে পারে। জমিতে শস্য বপন বা তোলার কাজে মানুষ সাধারণত দুই পা আড়াআড়ি করে সারিবদ্ধ অবস্থায় কাজ করে। তারা স্টেপ ভোল্টেজের কারণে মারা যেতে পারে। তবে কৃষিকাজ করার সময় কৃষকরাই বজ্রপাতের আঘাতে বেশি মৃত্যুবরণ করে যা প্রায় ৭০ শতাংশ। বাড়িতে ফেরার পথে বজ্রপাতে মারা যায়

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

১৪.৫ শতাংশ। নদী বা পুকুরে গোসল এবং মাছ ধরা অবস্থায় মারা যায় ১৩.৪ শতাংশ। অন্যদিকে ঘরের ভিতরে মোট প্রাণহানির সংখ্যা ২১ শতাংশ। তাই

বজ্রপাত থেকে রক্ষা পেতে হলে সচেতনতা সবচেয়ে জরুরি। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে গত কয়েকদিন ধরে বজ্রপাতে মৃত্যু বেড়েই চলেছে। সর্বশেষ ২০শে মে দেশের তিন জেলায় অন্তত ১০ জন প্রাণ হারিয়েছেন এই প্রাকৃতিক দুর্যোগে। ত্রাণ ও দুর্যোগ মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে এক বিজ্ঞপ্তিতে দেশবাসীর উদ্দেশে বলা হয়েছে, বজ্রপাত থেকে নিরাপদ থাকতে নিজে জানুন, অন্যকে জানান। এটি থেকে বাঁচতে জরুরি ভিত্তিতে ১৮ টি উপায়ও বলে দিয়েছে মন্ত্রণালয়। যেগুলো মেনে চললে অন্ততপক্ষে কিছুটা রক্ষা পাওয়া যাবে। সেগুলো হলো:

- এপ্রিল-জুন মাসে বজ্রবৃষ্টি বেশি হয়; বজ্রপাতের সময়সীমা সাধারণত ৩০-৪৫ মিনিট স্থায়ী হয়। এ সময়টুকু ঘরে অবস্থান করুন।
- ঘন কালো মেঘ দেখা দিলে ঘরের বাহির হবেন না; অতি জরুরি প্রয়োজনে রাবারের জুতা পরে বাইরে বের হতে পারেন।
- বজ্রপাতের সময় খোলা জায়গা, খোলা মাঠ অথবা উঁচু স্থানে থাকবেন না।
- বজ্রপাতের সময় ধানক্ষেত বা খোলা মাঠে থাকলে তাড়াতাড়ি পায়ের আঙুলের ওপর ভর দিয়ে এবং কানে আঙুল দিয়ে মাথা নিচু করে বসে থাকুন।
- যত দ্রুত সম্ভব দালান বা কংক্রিটের ছাউনির নিচে আশ্রয় নিন। টিনের চালা যথাসম্ভব এড়িয়ে চলুন।
- উঁচু গাছপালা ও বৈদ্যুতিক খুঁটি ও তার বা ধাতব খুঁটি, মোবাইল টাওয়ার ইত্যাদি থেকে দূরে থাকুন।

- কালো মেঘ দেখা দিলে নদী, পুকুর, ডোবা বা জলাশয় থেকে দূরে থাকুন।
- বজ্রপাতের সময় গাড়ির ভেতর অবস্থান করলে, গাড়ির ধাতব অংশের সঙ্গে শরীরের সংযোগ ঘটাবেন না; সম্ভব হলে গাড়িটি নিয়ে কোনো কংক্রিটের ছাউনির নিচে আশ্রয় নিন।
- বজ্রপাতের সময় বাড়িতে থাকলে জানালার কাছাকাছি ও বারান্দায় থাকবেন না। জানালা বন্ধ রাখুন এবং ঘরের ভেতরে বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম থেকে দূরে থাকুন।
- বজ্রপাতের সময় মোবাইল, ল্যাপটপ, কম্পিউটার, ল্যান্ডফোন, টিভি, ফ্রিজসহ সব বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ব্যবহার থেকে বিরত থাকুন এবং এগুলো বন্ধ রাখুন।
- বজ্রপাতের সময় ধাতব হাতলযুক্ত ছাতা ব্যবহার করবেন না। জরুরি প্রয়োজনে প্লাস্টিক বা কাঠের হাতলযুক্ত ছাতা ব্যবহার করতে পারেন।
- বজ্রপাতের সময় শিশুদের খোলা মাঠে খেলাধুলা থেকে বিরত রাখুন এবং নিজেরাও বিরত থাকুন।
- বজ্রপাতের সময় ছাউনি বিহীন নৌকায় মাছ ধরতে যাবেন না, তবে এ সময় সমুদ্র বা নদীতে থাকলে মাছ ধরা বন্ধ রেখে নৌকার ছাউনির নিচে অবস্থান করুন।
- বজ্রপাত ও ঝড়ের সময় বাড়ির ধাতব কল, সিঁড়ির ধাতব রেলিং, পাইপ ইত্যাদি স্পর্শ করবেন না।
- প্রতিটি বিল্ডিংয়ে বজ্র নিরোধক দণ্ড স্থাপন নিশ্চিত করুন।
- খোলাস্থানে অনেকে একত্রে থাকাকালীন বজ্রপাত শুরু হলে প্রত্যেকে ৫০ থেকে ১০০ ফুট দূরে দূরে সরে যান।

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

- কোনো বাড়িতে যদি পর্যাপ্ত নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা না থাকে তাহলে সবাই এক কক্ষে না থেকে আলাদা আলাদা কক্ষে যান।
- বজ্রপাতে কেউ আহত হলে বৈদ্যুতিক শকে আহতদের মতো করেই চিকিৎসা করতে হবে। প্রয়োজনে দ্রুত চিকিৎসককে ডাকতে হবে বা হাসপাতালে নিতে হবে। বজ্রে আহত ব্যক্তির শ্বাস-প্রশ্বাস ও হৃদস্পন্দন ফিরিয়ে আনার চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

এছাড়াও যুক্তরাষ্ট্রে বজ্রপাতে বিপদাপন্ন পরিমাপের একটা জনপ্রিয় পদ্ধতির নাম ৩০-৩০ বা '৩০ সেকেন্ড ও ৩০ মিনিট'। বজ্রপাত দেখা ও শোনার সময় থেকে ৩০ সেকেন্ড গুনতে হবে। যদি দুটির মধ্যকার সময় ৩০ সেকেন্ডের কম হয় তবে সঙ্গে সঙ্গে নিরাপদ স্থানে চলে যেতে হবে। অথবা যদি বজ্রঝড়ের শব্দ শুনা যায় তবে নিরাপদ স্থানের সন্ধান করা সবচেয়ে নিরাপদ। কারণ বজ্রপাত সাধারণত ঝড়ের সময় বা ঝড়ের পরপরই হয়ে থাকে। বজ্রঝড়ের শেষ শব্দ শোনার পর থেকে ৩০ মিনিট নিরাপদ স্থানে অবস্থান করতে হবে। তা না হলে বজ্রপাতে মৃত্যু বা জখমের ঝুঁকি থাকে।

বাংলাদেশে বজ্রপাতে মানুষের মৃত্যু কমানোর জন্য ২০১৭ সালে দেশব্যাপী ১০ লাখ তালগাছ রোপণ করেছে সরকার। সুদূরপ্রসারী এ সিদ্ধান্তের ফলে দেশে বজ্রপাতে মৃত্যুর সংখ্যা অনেকাংশেই কমেছে। সম্প্রতি এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে যে এলাকায় তালগাছ বেশি আছে সেই এলাকায় বজ্রপাতে মৃত্যুর সংখ্যা অনেক কমে গেছে।

মোটকথা বজ্রপাতে ভয় না পেয়ে সচেতনতা অবলম্বন করা সবচেয়ে জরুরি। ■

লেখক: প্রাবন্ধিক

মোঃ আব্দুল্লাহ, নার্সারি শ্রেণি, আল কারিম স্কুল, সাভার

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

নিবন্ধ

মা দিবসের গল্প

মারজুক রাসেল

'মা'-ছোট্ট একটা শব্দ কিন্তু কি বিশাল তার পরিধি। এই শব্দটি শুধু মমতার নয় ক্ষমতারও। মায়ের অনুগ্রহ ছাড়া কোনো প্রাণীর পক্ষেই প্রাণধারণ করা সম্ভব নয়। তিনি আমাদের গর্ভধারিনী, জননী। মাকে ভালোবাসার জন্য আলাদা কোনো দিবসের প্রয়োজন হয় না। প্রতিদিন, প্রতিক্ষণই মায়ের ভালোবাসা কাজ করে। মায়ের কথা মনে হলেই মনে পড়ে যায় সুধীর লাল চক্রবর্তীর বিখ্যাত এই গানটি–

মধুর আমার মায়ের হাসি
চাঁদের মুখে ঝরে,
মাকে মনে পড়ে আমার
মাকে মনে পড়ে।

এখন দেশে দেশে বিশেষ দিনে 'মা দিবস' পালনের রীতি দেখা যায়। তবে সব দেশে একই দিনে মা দিবস পালিত হয় না। মে মাসের দ্বিতীয় রোববার অনেক দেশেই এখন মা দিবস পালিত হয়। দিবসটিতে মাকে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জানায় সন্তানেরা। শুধু নিজের মা নয়, বিশ্বের সব মায়ের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে শেখায় এ দিনটি।

প্রাচীন গ্রিসে 'বিশ্ব মা দিবস' পালন করা হলেও আধুনিক মা দিবসের প্রচলন হয় যুক্তরাষ্ট্রে। দিবসটির প্রবক্তা আনা জার্ভিস। তার মা অ্যান মেরি রিভস জার্ভিস ছিলেন একজন শান্তিবাদী সমাজকর্মী। তিনি 'মাদারস ডে ওয়ার্ক ক্লাব' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ১৯০৫ সালে অ্যান মারা যান। তার মৃত্যুর পর মেয়ে আনা মায়ের স্বপ্ন পূরণে কাজ শুরু করেন। সব মাকে শ্রদ্ধা জানাতে তিনি একটি দিবস প্রচলনের লক্ষ্যে সচেষ্ট হন।

১৯০৮ সালে পশ্চিম ভার্জিনিয়ার একটি গির্জায় আনা তার মায়ের স্মরণে প্রথম মা দিবস পালনের উদ্যোগ নেন। তখন থেকে বেসরকারি পর্যায়ে অ্যান মারিয়া রিভস জার্ভিসের মৃত্যুদিন ১০ই মে -কে 'মা দিবস' হিসেবে উদযাপন করা হতো। এরপর ১৯১৪ সালের ৯ই মে প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন প্রথমবারের মতো রাষ্ট্রীয়ভাবে ন্যাশনাল মাদার ডে ঘোষণা করেন এবং ঐদিন বিশেষ প্রার্থনা অনুষ্ঠান আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

ব্রিটেনে ষোড়শ শতকে গির্জাকেন্দ্রিক 'মা' দিবস উদ্‌যাপনের রেওয়াজ ছিল। পরবর্তীতে প্রতি বছর মে মাসের চতুর্থ রোববারকে 'মাদারিং সানডে' হিসেবে পালন করা হতো। ঐদিন ব্রিটিশরা নিজ নিজ মায়ের প্রতি শ্রদ্ধা জানাত। মায়ের সঙ্গে সময় দেওয়া ও মায়ের জন্য গিফট কেনা ছিল দিনটির কর্মসূচি।

বর্তমানে সারা বিশ্বেই 'মা দিবস' বেশ উৎসাহের সাথে পালন করা হয়। 'মা' শব্দটি কত পরিচিত ,কত আপন। ১৯১২ সালে আনা জারভির্সকে 'মাদারস ডে' প্রবর্তক হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এভাবেই মে মাসের দ্বিতীয় রোববার মা দিবস হিসেবে পালিত হচ্ছে। চীনের জনপ্রিয় একটি প্রথা হচ্ছে পারিবারিক নামগুলো এমন প্রতীক দিয়ে শুরু হয় যার অর্থ 'মা'।

মা কেবল মা নয়, মা অনির্বাচনীয় ভালোবাসা। মায়ের চিত্তের আকাশ অনেক বড়ো। একমাত্র মা-ই পারেন উত্তম সন্তান গড়তে। নেপোলিয়ন বলেছিলেন, আমি ভালো মা চাই, তাতেই উত্তম জাতি গড়ে উঠবে। সন্তানের ভুলগুলো মা দেখেন ক্ষমাসুন্দর চোখে। মা বিরাট এক ছাতা। সব ভালো জিনিসের মূর্ত প্রতীক হচ্ছেন মা।

ইউরোপীয় চেতনায় মাকে ওল্ডহোমে ফেলে রেখে একদিন গিফট নিয়ে যাওয়ার যে প্রবণতা আমাদের দেশে শুরু হয়েছে, সেটা আমরা চাই না। আমরা চাই প্রতিদিনই হোক মা দিবস। আমরা যেন আমাদের মাকে প্রতিদিনই মূল্যায়ন করতে পারি ও ভালোবাসতে পারি —এটাই হোক মা দিবসের প্রতিজ্ঞা। ■

লেখক: শিক্ষার্থী, বৃটিশ কাউন্সিল

ফামিন আজিজ, ৩য় শ্রেণি, মতিঝিল মডেল স্কুল, ঢাকা

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

ভ্রমণ কাহিনি

ঘুরে এলাম আগরতলা

তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

উজ্জয়ন্ত প্যালেস

ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী আগরতলা। বাংলাদেশের আখাউড়া স্থলবন্দরের ইমিগ্রেশন শেষ করে ভারতে প্রবেশ করলেই আগরতলা শহর। আগরতলা শহরে প্রবেশ করেই আমি একটু অবাক হলাম। যতই কাছে হোক না কেন দেশটা তো ভিন্ন। কিন্তু সেখানকার মানুষের কথাবার্তা শুনে মনেই হয়নি এটা কোনো ভিন্ন দেশ। অধিকাংশই কুমিল্লার আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলে। আমরা সেখানে গিয়েছিলাম বাংলাদেশের তথ্য মন্ত্রণালয়ের চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর থেকে। আগরতলায় অনুষ্ঠিত হাঁপানিয়া আন্তর্জাতিক বইমেলায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি হয়ে।

আমার জীবনে এটিই প্রথম দেশের বাইরে যাওয়া। তারপর অফিস টিমের সঙ্গে। প্রথমদিনেই হোটেলে পৌঁছে ফ্রেশ হয়ে সবার সঙ্গে একটা চায়নিজ রেস্টুরেন্টে খেতে যাওয়া। সেখানে সবজি, ডাল আর ভাত খেলাম। খাবারটা বেশ ভালোই লেগেছিল। তবে খাবারের চাইতেও খাবার পরিবেশনের সামগ্রী ছিল খুবই আকর্ষণীয়। তাই ছবি তুলতেও ভুল করলাম না। খাওয়া শেষ করেই চলে গেলাম বইমেলায়। কারণ মেলা শুরু হতো দুপুর ২.৩০ মিনিট থেকে আর শেষ হতো রাত ৯.০০টায়।

আমাদের হোটেল থেকে মেলা প্রাঙ্গণ ছিল বেশ দূরে। সিএনজিতে করে গেলাম। মেলা প্রাঙ্গণের বিশাল গেট দেখেই আমি বিস্মিত। ভিতরে প্রবেশ করে আলপনা করা রাস্তার দুপাশ দিয়ে সবাই সামনের দিকে এগুচ্ছে। আমরাও যাচ্ছি। এগুতেই চোখ পড়ল বামদিকে বড়ো করে লেখা বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ প্যাভেলিয়ন লেখাটা দেখেই মনটা ভরে গেল। বাংলাদেশ অংশেই ছিল দুটি স্টল। এক অংশ বাংলা একাডেমি আরেক অংশ চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের। প্রথমেই বাংলা একাডেমির স্টলের মাহবুবা আপা ও মুমিন ভাইয়ের সাথে পরিচয় পর্ব হলো।

মেলায় দায়িত্ব পালন করে তিনটা দিন চলে গেল। ৬ই মার্চ রাতে মেলা শেষ করে হোটেলে ফিরছি তখন মোহাম্মদ আলী সরকার (পরিচালক প্রশাসন ও প্রকাশনা) স্যার আমাদের বললেন আগামীকাল সকাল ৯টায় আমাদের হাইকমিশন অফিসে যেতে হবে। দাওয়াত এসেছে ৭ই মার্চের ভাষণ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার জন্য। সকালে নাশতা করেই আমরা চলে গেলাম বাংলাদেশ সহকারী হাইকমিশন অফিসে। সকাল ৯টায় জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়।

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

এরপর জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুস্পস্তবক অর্পণ, জাতির পিতাসহ সকল শহিদদের স্মরণে ১ মিনিট নীরবতা পালন, ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের ভিডিওচিত্র প্রদর্শন ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। স্বাগত বক্তব্য দেন অত্র মিশনের প্রথম সচিব জনাব মো. জাকির হোসেন ভূঁইয়া। এর মাঝে আরেকটি মজার ব্যাপার ছিল সেখানে ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েদের অংশগ্রহণে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণের প্রতিযোগিতার আয়োজন। একেকজন অতিথির আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে ছিল ছোট্ট বন্ধুদের ভাষণের পালা। একপর্যায়ে ডাক এল চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশাসন ও প্রকাশনা) জনাব মোহাম্মদ আলী সরকার স্যারের। অন্য সবার বক্তব্য থেকে ভিন্নধর্মী বক্তব্য দিলেন তিনি। কীভাবে ৭ই মার্চের ভাষণটি চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের কর্মীরা ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের সময় সংরক্ষণ করেছিলেন। অত্যন্ত চমৎকারভাবে স্যার এই ঘটনাটি গল্পের মতো উপস্থাপন করেন।

মেলা প্রাঙ্গনের ভিতরে আমাদের স্টলের ঠিক সামনেই ছিল বিশাল স্টেজ। সেখানে প্রতিদিন নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হতো। যা সবাইকে মুগ্ধ করত। আমরা স্টলে বসেই সেইসব অনুষ্ঠান উপভোগ করতাম। এর মধ্যে বাংলা একাডেমির মাহবুবা আপা ঘুরে এসেছেন আগরতলার বেশ কয়েকটি ঐতিহাসিক স্থানে। সেসব নিয়ে তার ভালো লাগার কথা আমাদের বললেন। তখন মোহাম্মদ আলী সরকার স্যারকে আমরাও যেতে চাই বলে সবাই আবদার করলাম। স্যার বললেন ঠিক আছে একদিন যাওয়া যাবে। ঠিক হলো ৯ই মার্চ যাব। তাই সেদিন সকাল ৮টায় নাশতা সেরে সবাই রেডি হয়ে যাই। এরই মধ্যে আগেই বলা রাখা মাইক্রোবাস এসে হাজির আমাদের হোটেলের নিচে। সবাই উঠে বসে আল্লাহর নামে বেড়িয়ে গেলাম। গাড়ির ড্রাইভার সাহেব গাড়ি চালাতে চালাতে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে দিয়ে যাচ্ছে। স্যার বললেন, চলেন দেখে যাই ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটের সামনে যেতেই আসলো বাধা, অনুমতি ছাড়া যাওয়া যাবে না। তাই কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে এক এক করে সবাই এন্ট্রি খাতায় নাম ঠিকানা লিখে পাসপোর্ট দেখিয়ে ঢুকলাম। ভিতরে কয়েক গজ যেতেই চোখে পড়ল রবীন্দ্র শতবার্ষিকী মুক্তাঙ্গন। এই মুক্তাঙ্গনটি উদ্‌বোধন করেছিলেন আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এটা দেখেই সবার ভালো লাগল। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের হয়ে গেলাম সিপাহীজলার জুওলজিক্যাল পার্কের দিকে। টিকেট কেটে ঢুকতেই মনে হলো গভীর অরণ্যে যাচ্ছি এবং অরণ্যের দুই ধারের গাছগুলো যেন আমাদের স্বাগতম স্বাগতম বলছে। সেখানে গিয়ে প্রথমেই দেখলাম অনেক বানর এদিক ওদিক ছোটাছুটি করছে। আরেকটু সামনে যেতেই দেখলাম একটি চিড়িয়াখানা সেখানে অনেক রকমের প্রাণী আছে। সব দিক দেখে সেখান থেকে বেড়িয়ে পড়লাম। এরপর ত্রিপুরার অন্যতম পর্যটন কেন্দ্র নীরমহলের দিকে যাত্রা। ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলা থেকে ৫৩ কি.মি. দূরে সিপাহীজলা জেলার মেলাঘরের রুদ্রসাগর লেকের মধ্যে অবস্থিত নীরমহল প্রাসাদ। গাড়ি থামল রুদ্রসাগর পাড়ে। গাড়ি থেকে নেমেই আমি একটু এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখি বিশাল আকারে একটি কালো হাতি আর সাথে দুলদুল ঘোড়া। না ভয় পেয়ো না বন্ধুরা

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

এরা সত্যিকারের ঘোড়া বা হাতি নয়, মাটির তৈরি। ওদের সাথে ছবি তুলে টিকেট কেটে বিশাল এক ইঞ্জিন চালিত নৌকায় আরো অনেকের সাথে আমরা উঠে পড়লাম। নীরমহলের সৌন্দর্য নৌকা থেকে দেখতেই যেন বেশি ভালো লাগে। দূর থেকে সম্পূর্ণ নীরমহলটা দেখতে কী যে ভালো লাগছিল সেটা কেউ বাস্তবে না দেখলে বুঝতে পারবে না। স্বাধীন দেশীয় রাজ্য ত্রিপুরার শেষ রাজা বীরবিক্রম মানিক্য বাহাদুর ১৯৩৮ সালে এই প্রাসাদটি তৈরি করেন। মহলটি তৈরি করতে প্রায় আট বছর সময় লেগেছিল। এটি মূলত গ্রীষ্মকালে অবসর কাটানোর জন্য ব্যবহার করতেন রাজা-রানি ও রাজ পরিবারের সবাই। এখনও গ্রীষ্মকালের প্রচণ্ড গরমে নীরমহল গেলে শীতল হাওয়ার ছোঁয়া লাগে শরীরে। এই প্রাসাদ মূলত দুটি ভাগে বিভক্ত- অন্দর মহল ও বাহির মহল। সব মিলে এখানে মোট ২৪টি কক্ষ রয়েছে। এছাড়াও আছে বাহারি ফুলের বাগান। বর্তমানে এই মহলের দায়িত্ব রয়েছে ত্রিপুরা সরকারের পর্যটন দফতরের হাতে। নীরমহল ঘুরে দেখে সবাই ক্লান্ত এবং ক্ষুধার্ত। এবার ড্রাইভার সাহেব নিয়ে গেলেন নীরমহল থেকে একটু দূরে একটি খাবার হোটেলে। সেখানে দুপুরের খাবার খেয়ে গাড়িতে উঠে গোমতী জেলার রাজনগরের ভুবনেশ্বরী মন্দিরের উদ্দেশ্যে আবার চলতে থাকা। মিনিট দশেক যেতেই ভুবনেশ্বরী মন্দিরে পৌঁছে গেলাম। এই মন্দিরটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দুটি নাটক রাজর্ষি ও বিসর্জন নামে অমর হয়ে আছে। ত্রিপুরার ভুবনেশ্বরী মন্দিরটি মহারাজা গোবিন্দ মানিক্য নির্মাণ করেন। এটি মহারাজা গোবিন্দ মানিকের পুরনো রাজপ্রসাদের খুব কাছে এবং দেখতে খুবই মনোরম।

এদিকে দুপুর গড়িয়ে যাচ্ছে পিছু হাতছানি দিচ্ছে বইমেলা। তাই গন্তব্যের পথে চলা শুরু, এর মধ্যে চলে এলাম আগরতলা হাপানিয়া বইমেলা। আমরা কয়েকজন নেমে গেলাম মেলায়। মেলা শেষ করে রাত দশটায় হোটেলে পৌঁছে ফ্রেস হয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। পরদিন সকালে কোভিড টেস্টে ত্রিপুরা সেন্ট্রাল হসপিটালে যেতে হবে। এত জায়গা ঘুরে, অনেক লোকের মাঝে বইমেলা যাত্রা করে কী জানি কারো করোনা পজেটিভ হয়ে গেল কিনা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়লাম।

পরদিন ত্রিপুরা সেন্ট্রাল হসপিটালে কোভিড টেস্টের স্যাম্পল দিয়ে এবার উজ্জয়ন্ত প্যালেসের দিকে যাত্রা যার বর্তমান নাম ত্রিপুরা সেন্ট্রাল জাদুঘর উজ্জয়ন্ত প্যালেসের সামনে অটো থামতেই চোখে পড়ল ফুলের বাগান। তার দুপাশে দুটি ভাস্কর্য। একটি ক্ষুদিরাম বসু আরেকটি মাস্টার দ্যা সূর্যসেন। যেন বীরদর্পে দাঁড়িয়ে আছেন দুজনে। প্যালেসটি দূর থেকে দেখতে অনেকটা আহসান মঞ্জিল জাদুঘরের মতো। উত্তর-পূর্ব ভারতের সবচেয়ে সমৃদ্ধ জাদুঘর উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ। ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলার প্রাণকেন্দ্রে শ্বেত শুভ্র প্রাসাদটি ২০ একর জমির উপর স্থাপিত। স্থানীয়রা রাজবাড়ি নামেই চিনে। ১৯০১ সালে তৎকালীন রাজা রাধা কিশোর মানিক্য এটি তৈরি করেন। প্রাসাদের নিচ ও দ্বিতীয় তলায় সুন্দর পরিপাটি জাদুঘর। জাদুঘরটিতে আছে সারা ভারত এবং সেভেন সিস্টার্সের রাজ্যগুলোর বিভিন্ন যুগের প্রত্নতত্ত্ব। রয়েছে চারু ও কারুশিল্পের অনেক নিদর্শন এবং বিশ্বকবি রবীন্দ্র গ্যালারি।

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

তবে এই জাদুঘরে বাংলাদেশের পর্যটকদের জন্য সবচেয়ে আকর্ষণীয় হলো বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ গ্যালারি। এই গ্যালারিতে প্রবেশ করে তো আমরা অবাক! মনে হলো যেন আমাদের দেশের জাদুঘরে এসেছি। এ গ্যালারিতে সাজানো আছে মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে বাংলাদেশ থেকে আসা শরণার্থীদের ছবি। তৎকালীন ফটো সাংবাদিক রবিন সেনগুপ্তের এসব দুর্যোকালীন ছবিতে ফুটে উঠেছে শরণার্থীদের দুঃখ-দুর্দশার চিত্র। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ থেকে আসা তরুণ মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণের ছবি। আরো আছে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের

নীরমহল, আগারতলা

ভাষণ, ২৫ শে মার্চের গণহত্যা, ২৬ শে মার্চের বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা, ১৭ই এপ্রিল মুজিবনগর সরকার গঠনের ছবি। এছাড়া মুক্তিযুদ্ধের সময়ে ঢাকা ও চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত দৈনিক পত্রিকা যেমন- দৈনিক আজাদ, দৈনিক বাংলা, সংবাদসহ আরো অনেক পত্রিকা সাজানো রয়েছে এই গ্যালারিতে। এছাড়া আছে ১৬ই ডিসেম্বর রেসকোর্স ময়দানে বাংলা দেশের কাছে পাকিস্তানের আত্মসমর্পণের প্রতিচ্ছবি। এসব দেখে ছবি তুলতে খুব ইচ্ছে হয়েছিল। কিন্তু না ছবি তোলা নিষেধ। তাই আর ছবি তোলা হলো না।

পরদিন কোভিড টেস্টের রিপোর্ট সবার নেগেটিভ হওয়ায় নিশ্চিন্ত মনে সবাই যে যার মতো কেনাকাটা করে নিলাম। দুপুরের খাবার সেরে একটু আগেই মেলায় চলে গেলাম। শেষের দিন ডিসকাউন্ট দেওয়ায় আমাদের স্টলে উপচেপড়া ভিড় ছিল। সেদিন বই বিক্রিও হয়েছে অনেক। মেলা শেষে বাকী বইগুলো কমিশনকে বুঝিয়ে দিয়ে হোটেলে চলে আসা। পরদিন সকালে দেশে ফেরার প্রস্তুতি। আগরতলার ভাষা, সেখানকার মানুষ, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, কোলাহলমুক্ত, যানজটমুক্ত বিশুদ্ধ বাতাস, প্রকৃতি সবকিছু মিলে ভ্রমণটা যেমন ছিল উপভোগ্য, তেমনিই স্মরণীয়। ■

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

গল্প

সাপ, বেজি ও ব্যাঙ

ওয়াহিদ মুস্তাফা

এক আছে গ্রাম। সেই গ্রামে একটি বন আছে– বেশ বড়ো বন। অনেক বড়ো বড়ো গাছ আছে সেই বনে। সেখানে নানা ধরনের পশুপাখি থাকে –শিয়াল, বেজি, শকুন, প্যাঁচা, কাক, ঘুঘু, দোয়েল, নেকড়ে, হায়েনা, বানর, সাপ, ব্যাঙ ইত্যাদি।

একদিন এক শিয়ালের সাথে হায়েনার দেখা হয়। তারা দুইজনে কথা বলতে বলতে সেখানে একটি বেজি চলে আসে। একটি সাপ দূর থেকে সব ঘটনা দেখছিল আর সুযোগ খুঁজছিল ওদেরকে কামড়ানোর। তখন সাপ এগিয়ে আসলো এবং হঠাৎ ফণা উঁচিয়ে বেজির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। বেজিও তৈরি হয়েই ছিল। সে তাড়াতাড়ি একপাশে সরে গেল আর সাপের ছোবল পড়ল মাটিতে। সে আবারও তেড়ে আসলো বেজির দিকে। এভাবে কিছুক্ষণ লড়াই চলার পর বেজি জিতে গেল আর সেই সুযোগে সাপকে খেয়ে বেজি নিজের পেটটা ভরে নিল। সবাই বেজিকে ধন্যবাদ দিল বিষাক্ত সাপের হাত থেকে তাদেরকে বাঁচানোর জন্য।

এই সবকিছুর পর শিয়াল বলল, এক ঝাঁক বোলতা আমাদের রাজ্য দখল করতে চায়। তারা হুমকি দিচ্ছে।

এ কথা শোনার পর সবাই চিন্তার সাগরে ডুবে গেল। হায়েনা বলল, ব্যাঙকে ডাকলে কেমন হয়? তার মাথায় অনেক বুদ্ধি।

বেজি বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক বলেছ। ব্যাঙ এসে বোলতাদের খেয়ে ফেলুক।

তারপর ওরা ব্যাঙকে ডাকল। ব্যাঙ লাফিয়ে লাফিয়ে ওদের কাছে এল। ব্যাঙকে বোলতাদের কথা বলা হলো। ব্যাঙ বলল– ভাইসব, কাউকে খেয়ে ফেলা ঠিক কাজ নয়।

সবাই বলল, না খেয়ে বোলতা তাড়াবে কীভাবে?

ব্যাঙ বলল, কোনো চিন্তা করবে না। আমি হলাম ব্যাঙের রাজা কোলাব্যাঙ। আমি এখনই বোলতাদের রাজার সাথে কথা বলে সব ঠিক করে আসছি। তোমরা ভেবো না।

এই বলে ব্যাঙ বোলতাদের রাজার কাছে গেল। বলল, রাজামশাই, এই বনে থাকতে হলে এইসব দখল-ফখল চলবে না। হিংসুটেপনাও চলবে না। বনের সব পশুপাখি একজোট হয়েছে। বেশি বাড়াবাড়ি করলে কিন্তু তোমরা জানে মারা পড়বে। এখানে ভদ্রসভ্য হয়ে থাকতে হবে। বলো, তোমরা রাজি?

বোলতাদের রাজা খুব ভয় পেয়ে যায়। বলল, রাজি।

ব্যাঙ তখন হাসতে হাসতে ফিরে আসে। শিয়াল, বেজি, হায়েনা আর বনের অন্য পশুপাখিরা সবাই একসাথে ব্যাঙকে ঘিরে নাচগান করতে লাগল। ■

শিক্ষার্থী, শিশুকলি নার্সারি স্কুল, যশোর

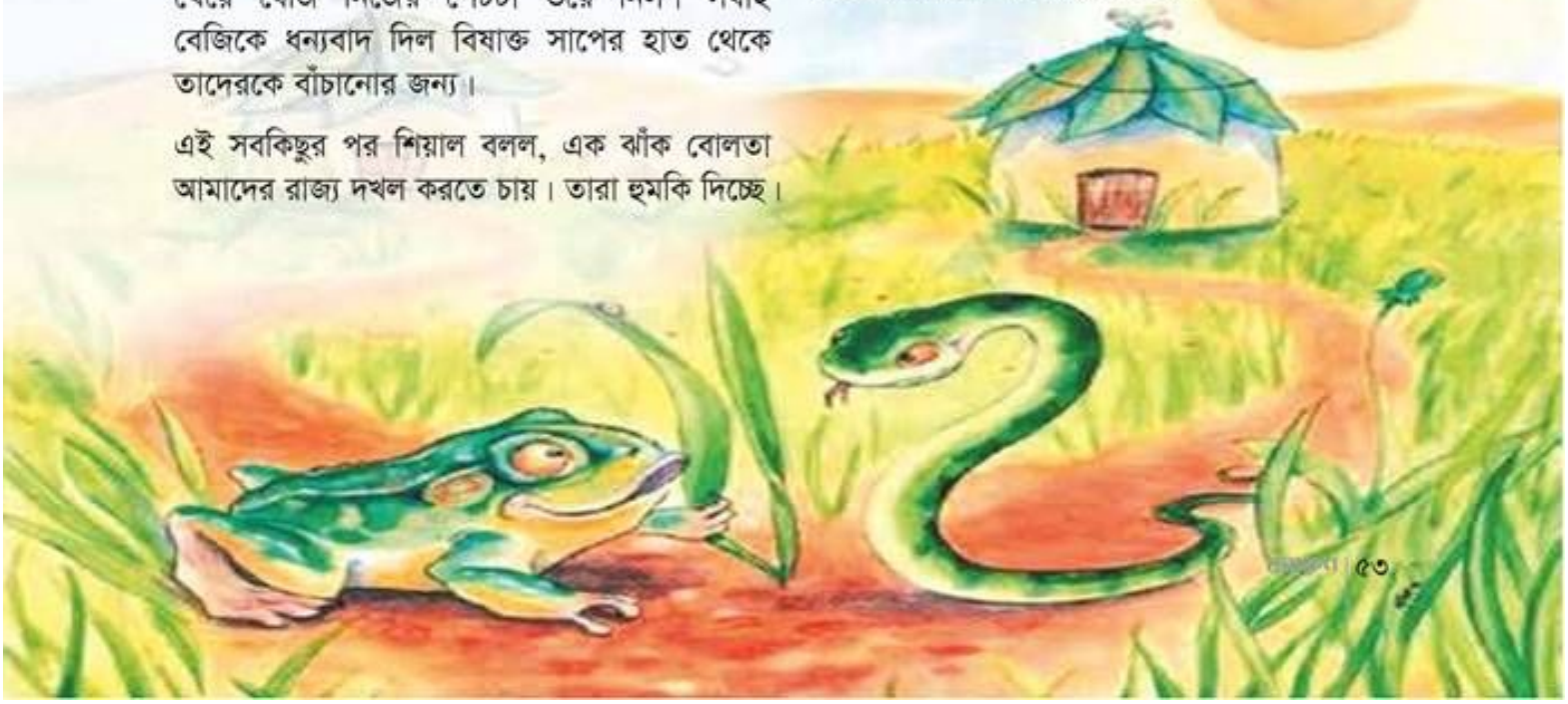

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

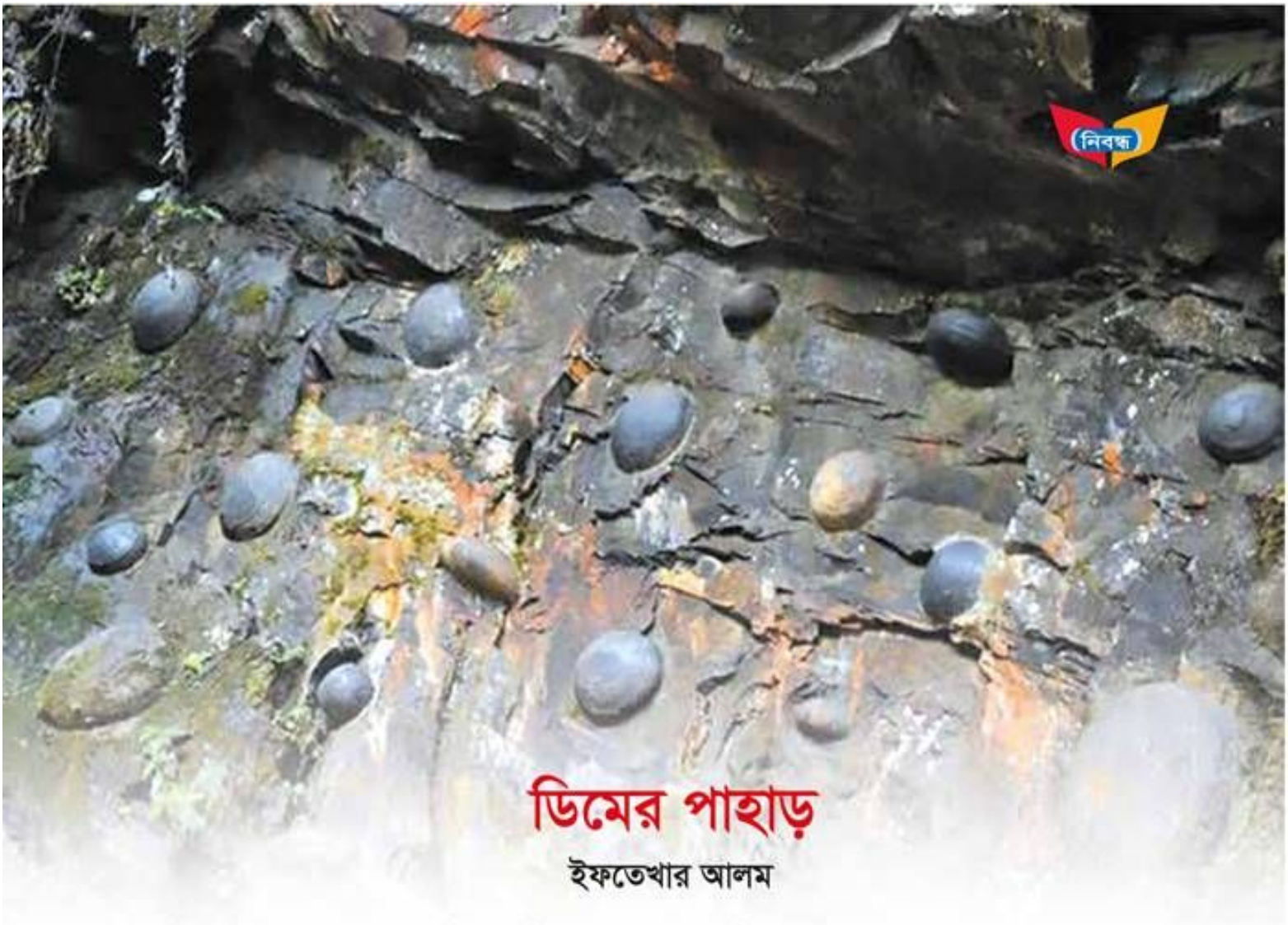

ডিমের পাহাড়

ইফতেখার আলম

ছোট্ট বন্ধুরা, তোমরা সবাই নিশ্চয়ই ডিম খেতে পছন্দ করো তাই না! আমারও অনেক পছন্দ ডিমের তৈরি খাবার। হাঁস-মুরগির ডিম আমাদের প্রিয় খাবার হলেও পৃথিবীর অনেক প্রাণী এই ডিমের মাধ্যমেই বংশবিস্তার করে। এটি খুব পুরনো এবং জানা তথ্য। তবে পাহাড়ও যে ডিম পাড়ে, একথা কি জানতে তোমরা? অবাক হয়ে অনেকেই ভাবছ এটি কি করে সম্ভব ! একটি পাহাড়ে কী করে ডিম পাওয়া যেতে পারে। ডিম পাড়ে পাহাড় ! তাও আবার মসৃণ কালো ডিম ! হ্যাঁ, পাহাড়টির মান্দারিন ভাষায় আঞ্চলিক নাম 'চান দান ইয়া'(Chan Dan Ya)। বাংলা অর্থ 'ডিম পাড়া পাহাড়' বা এগ মাউনটেইন। পাহাড়টি রয়েছে আমাদের দেশের খুব পাশেই।

চীনে অবস্থান এই পাহাড়টির। এই পাহাড়টি আসলে গানডেং পর্বত শ্রেণির একটি অংশ। পাহাড়ের যে অংশে ডিম পাওয়া যায় সেটি লম্বায় ৯ ফুট এবং চওড়ায় প্রায় ৬৫ ফুট। তবে ডিমগুলো সত্যিকারের নয়, পাথরের! ডিমের মতো গোল ও মসৃণ হওয়ায় একে ডিম ভেবে অনেকেই ভুল করেন। এগুলো আসলে পাথর যা এমন আকার ধারণ করেছে আবহাওয়ার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে। এক একটি ডিম পাড়তে পাহাড়ের সময় লেগে যায় প্রায় ৩০ বছর। পাহাড় বলেই হয়ত একটা ডিম পাড়তে সময় লাগে এত বছর ! এরপর ডিম ধীরে ধীরে পরিণত হতে হতে পাহাড়ের পাদদেশে এসে জমা হয়। চীনের গুউঝু প্রদেশের কিয়ানান বুয়ী ও মিয়াও অঞ্চল জুড়ে এই পাহাড় রয়েছে।

অবাক ব্যাপার হলো পাহাড়ের পুরো অংশই ডিম পাড়ে না, একটি বিশেষ অংশের আছে এই আশ্চর্য ক্ষমতা ! ওই অল্প জায়গা জুড়েই গাদা গাদা ডিম ! পাহাড়ের গা ফুঁড়ে যা বের হয়ে আসছে ! পাহাড়ের ডিম যেই পরিপূর্ণ রূপ ধরে, ওমনি সে টুক করে পাথরের গা খসে নেমে আসে পাদদেশে। ভূতত্ত্ববিদরা পাথরের ডিমের রহস্য খুঁজে পেতে গবেষণা করে যাচ্ছে অবিরত। সঠিক উত্তর এখনও অজানা। তবে একটা ব্যাখ্যা দাঁড় করানো গিয়েছে।

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

ব্যাখ্যা হলো, গান্ডেং পর্বত শ্রেণি মূলত পাললিক শিলায় গঠিত যা সাধারণত অতিরিক্ত শক্ত কিন্তু ব্যতিক্রম এই চান দান ইয়া যা গঠিত চুনাপাথরে। অপেক্ষাকৃত নরম, সহজেই ক্ষয় হয় কিন্তু তাতে যে পাললিক শিলার অংশ থাকে, সেগুলো কিন্তু ক্ষয় হয় না সহজে। এর ফলেই পাহাড়ের গায়ে প্রাকৃতিক অভিযোজনে ভেসে ওঠে ডিম ! ডিমের আশপাশের অংশ যত ক্ষয় হয়, ডিমও তত বড়ো হয়। এরপর ডিম সম্পূর্ণ তৈরি হলে আশপাশের অংশ ক্ষয়ে যাওয়ায় ও ডিমের ওজন বেড়ে যাওয়ায় সেটি নেমে আসে পাহাড়ের পাদদেশে। সেখানে যে চুনাপাথর রয়েছে তা প্রায় ৫০ কোটি বছর আগে সৃষ্টি হয়েছিল। তবে সেগুলো এখনও কী করে অক্ষত রয়েছে সেটি একটি প্রাকৃতিক রহস্য।

কিন্তু ডিমগুলো কীভাবে অমন গোল হয় তা ভাবাচ্ছে বিজ্ঞানী ও গবেষকদের।

পাহাড়ের কাছেই রয়েছে গুলু নামের একটি গ্রাম যে গ্রামের মানুষের কাছে ডিমের ব্যাখ্যা সহজ সরল। গ্রামের বাসিন্দারা এই পাথরগুলোকে ঈশ্বরের দান বলে মনে করেন। তারা রীতিমতো পুজো করেন এই পাথরের টুকরোগুলোকে। এক একটি বাড়িতে একটি করে এমন ডিম দেখতে পাবে তোমরা। গ্রামবাসীর বিশ্বাস, আশ্চর্য পাহাড়ের অদ্ভুত ডিম পরিবারে সৌভাগ্য বয়ে আনে। শুধু বাসিন্দা নয়, পর্যটকদের কাছেও জনপ্রিয় চান দান ইয়া'র এই ডিমগুলো। ■

লেখক: প্রাবন্ধিক

আদ্রিতা খানম নিথর, ১ম শ্রেণি, বোয়ালী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, গাজীপুর

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

নিবন্ধ

মিনি সুন্দরবন

শাহানা আফরোজ

বাঁকখালী নদীর মোহনায় বিশাল সুন্দরবন
ছড়িয়ে আছে সেখানে সাত রাজার ধন

কি বন্ধুরা, পড়ে খুব অবাক হচ্ছো তাই না ! ভাবছ বাঁকখালির মোহনায় আবার সুন্দরবন এল কোথা থেকে। অবাক না হয়ে পড়ে দেখো আসল ঘটনাটা কী!

দু-দিকে বঙ্গোপসাগর। একদিকে বাঁকখালী নদীর মোহনা। এর মাঝে প্রায় ৭০০ হেক্টর জমিতে বিশাল সবুজ বন। পরিবেশের ভাষায় এটি 'ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট'। বাঁকখালী নদীর তীর ঘেঁষে গড়ে ওঠা এ প্যারাবনের ভেতর প্রবেশ করলে মুগ্ধ না হয়ে ফেরার উপায় নেই। সারি সারি বাইন, কেওড়া গাছ আর নানা প্রজাতির শ্বাসমূলী উদ্ভিদের (ম্যানগ্রোভ) এ বনের গাছের মাথা ছুঁয়ে উড়ে যায় বকের সারি, কিংবা পরিযায়ী পাখি। কখনো বন্য শূকর দৌড়ে পালায় বনের ভেতর। দেখে মনে হবে, এ বুঝি আরেক সুন্দরবন। মহেশখালী-কুতুবদিয়া ও সোনাদিয়া উপকূলে যাওয়ার পথেই বাঁকখালী নদীর মোহনায় দেখা মেলে এ বনের। ওই প্যারাবন সরকারের পরিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকার আওতায় পড়ে। পরিবেশ অধিদফতরের উদ্যোগে ঝড়-জলোচ্ছ্বাসের কবল থেকে উপকূলীয় এলাকার মানুষকে রক্ষার জন্যই মূলত এ বন গড়ে তোলা হয়েছে। পরিবেশ অধিদপ্তরের জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক সমাজভিত্তিক জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন নামের প্রকল্পের আওতায় একটি বেসরকারি সংস্থা কক্সবাজার উপকূলে শ্বাসমূলী উদ্ভিদের বন সৃষ্টির কাজ করেছে। ধীরে ধীরে এককালের বিপন্নপ্রায় ওই প্যারাবন আজ বিশাল বনে পরিণত হয়েছে ।

পরিবেশ অধিদপ্তরের মতে, এ বনে (প্যারাবন) ১২ হাজারেরও বেশি প্রাণী ও উদ্ভিদের প্রজাতি রয়েছে। এর মধ্যে উদ্ভিদ রয়েছে ৫৬৭ প্রজাতির। শামুক-ঝিনুক ১৬২ প্রজাতির, কাঁকড়া ২১, চিংড়ি ১৯, লবস্টার ০২, মাছ ২০৭, উভচর ১২ ও ১৯ প্রজাতির সরীসৃপ। এ প্যারাবনে প্রায় ২০৬ প্রজাতির পাখির বিচরণ রয়েছে। এর মধ্যে দেশি ১৪৯ ও ৫৭ প্রজাতির অতিথি পাখি রয়েছে। বিশ্বের বিলুপ্তপ্রায় অনেক পাখিও এখানে দেখা যায়। কক্সবাজারের এ ম্যানগ্রোভ ফরেস্টকে বিকল্প সুন্দরবন অথবা মিনি সুন্দরবন বললেও ভুল হবে না। সবুজ ঝর্ণা আর প্রাণীর এই অপূর্ব সম্মিলনকে কাজে লাগাতে চায় বন

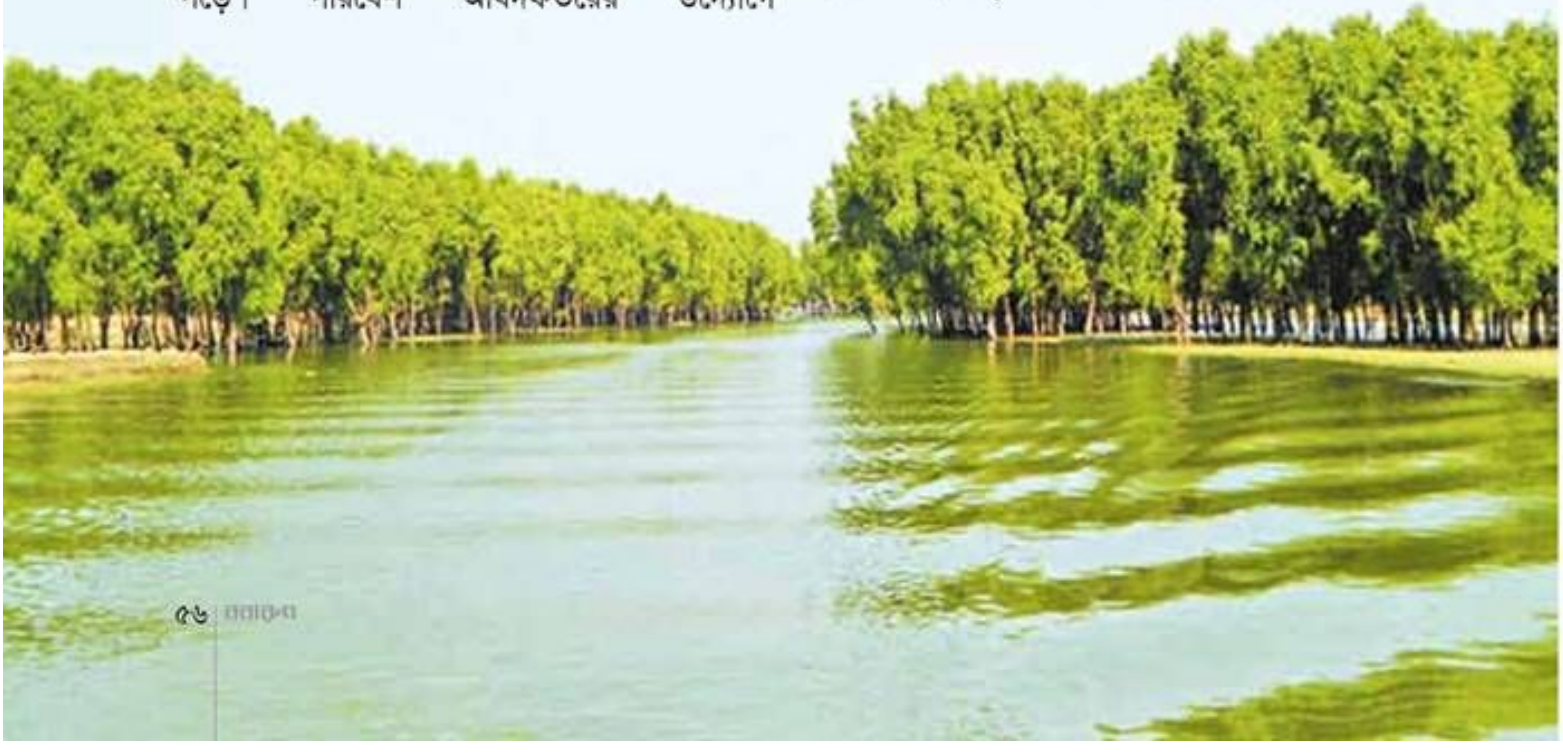

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

ও পরিবেশ অধিদপ্তর। তাই তো ২০১৫ সালের আগস্ট মাসে এখানে উদ্‌বোধন করা হয়েছে পর্যবেক্ষণ টাওয়ার। এরপর থেকে রূপ ও সৌন্দর্য্য বেড়েই চলছে 'মিনি সুন্দরবনের'। যা কক্সবাজার পর্যটনে যোগ করেছে নতুন মাত্রা।

সূর্যোদয় দেখার সুযোগ রয়েছে এখানে। পর্যটকরা ভ্রমণের পাশাপাশি জীববৈচিত্র্য ও পাখির অভয়ারণ্য দেখে আনন্দে আত্মহারা হয়ে যাবে।

প্যারাবনের পাশেই রয়েছে দক্ষিণ এশিয়ার বৃহত্তম শুঁটকি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল নাজিরারটেক শুঁটকিমহাল। সমুদ্রের ঠান্ডা হাওয়া, ঝাউবনের ছায়া আর সৈকতে ভেজা বালুতে কাঁকড়ার আলপনা দেখতে দেখতে মন জুড়িয়ে যাবে। বড়ো বড়ো ঝাউগাছের মাঝে মধ্যে আছে মাঝারি আর ছোটো আকারের ঝাউগাছ। দূর থেকে এত সুন্দর লাগে যে একটা সেলফি না তুললে মনে হবে ভ্রমণে আসাই বৃথা। এবার জেনে নাও কীভাবে যাবে। দক্ষিণ এশিয়ার বৃহত্তম শুঁটকিমহাল নাজিরারটেকে যাওয়ার প্রথম শর্তই হচ্ছে কক্সবাজার যাওয়া। আর কক্সবাজার যাওয়ার প্রক্রিয়া আমরা সবাই জানি। কক্সবাজার শহর থেকে অটোতে সমিতিপাড়া অথবা নাজিরারটেক। আর অটো থেকে নেমেই দেখবে বিশাল শুঁটকিমহাল তোমাদের হাতছানি দিয়ে ডাকছে। আবার কক্সরাঘাট থেকে স্পিডবোটে বাঁকখালীর মোহনা থেকে প্যারাবন হয়ে নাজিরারটেক। সোনাদিয়া দ্বীপ কক্সবাজার শহর থেকে নাজিরারটেকের দূরত্ব মাত্র ৩০ মিনিট। তাই কক্সবাজার শহর থেকে যে-কোনো সময় মিনি সুন্দরবনে যাওয়া যাবে অনায়াসে। ■

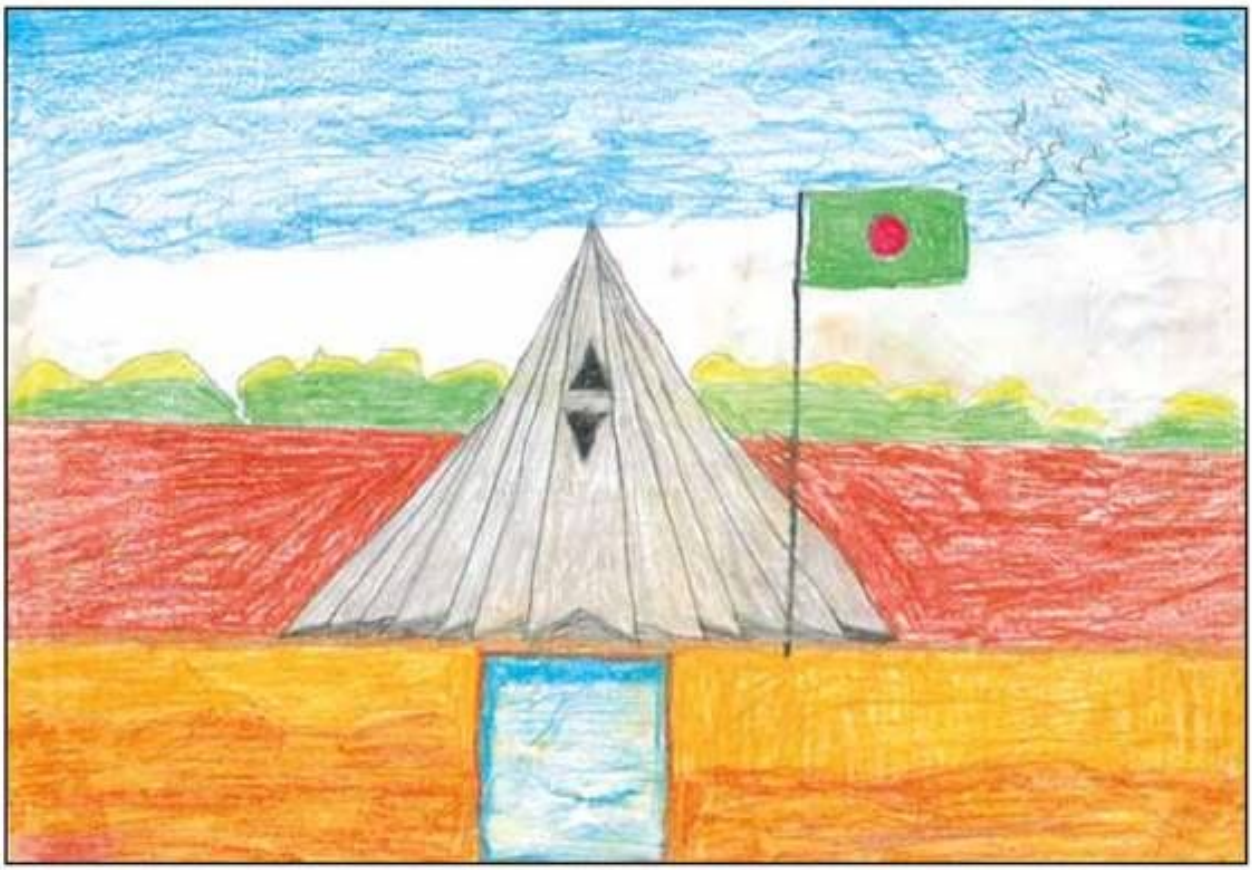

তাসদিদ তাবাসুম আসফিয়া, ২য় শ্রেণি, রাজারবাগ পুলিশলাইন স্কুল, ঢাকা

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

বিশ্বের দামি আম বাংলাদেশে | রামিন আলম

পাহাড়ি জেলা খাগড়াছড়ি সদর থেকে ২৫ কিলোমিটার দূরে মহালছড়ি উপজেলার ধুমনিঘাট এলাকা। এই এলাকায় উঁচু পাহাড়ের ঢালুতে থোকায় থোকায় ঝুলছে রঙিন আম। একটি বা দুইটি নয়, এ রকম ১২০টি গাছে ঝুলছে রঙিন আম। বাহারি এ আম সবুজ পাহাড়কে আরো রঙিন করে তুলেছে। আমটির নাম 'মিয়াজাকি' বা 'রেড ম্যাংগো' বা 'এগ অব দ্য সান' যা বাংলাদেশে 'সূর্যডিম আম' নামেই পরিচিত। এটি পৃথিবীর সবচেয়ে দামি ও পুষ্টিসমৃদ্ধ আমের প্রজাতি হিসেবে স্থান করে নিয়েছে। খাগড়াছড়ির পাহাড়ে বিশ্বের সেরা ও দামি আমের খেতাব পাওয়া মিয়াজাকি বা সূর্যডিম আমের চাষ করে সাফল্য পেয়েছেন কৃষক হ্ল্যাশিমং চৌধুরী। ওই ফার্মে ২০১৬ ও ২০১৭ সালে শখের বসেই মিয়াজাকি আমের চাষাবাদ শুরু করেন তিনি। জাপানের মিয়াজাকি অঞ্চলের এ আম প্রথমবারের মতো চাষ করে সফল হয়েছেন তিনি। ভারতের পুনে থেকে ২০১৭ সালে মিয়াজাকি আমের মাতৃচারা সংগ্রহ করেন হ্ল্যাশিমং চৌধুরী। এরপর তার বাগানে কলম চারার মাধ্যমে ১২০টি চারা উৎপাদন করেন। বাণিজ্যিকভাবে লাগানো বাগানে ২০১৯ সাল থেকে ফলন আসতে থাকে। ২০২০ সালেও ভালো ফলন হয়। প্রতিটি আমের ওজন প্রায় ৩০০ গ্রাম। পুরো আম লাল রঙে মোড়ানো। জাপানিজ এ আমটির স্বাদ অন্য আমের চেয়ে প্রায় ১৫ গুণ বেশি। আমটি খেতে খুবই মিষ্টি। এর গড় ওজন প্রায় ৭০০ গ্রামের মতো। বিশ্ব বাজারে এর দাম প্রায় ৭০ ডলার বা ৬ হাজার টাকা। সে হিসাবে প্রতি ১০ গ্রাম আমের দাম এক ডলারের মতো। আমটি স্বাদের চেয়ে চাষ পদ্ধতির কারণে বেশি দামি। সূর্যডিম আমটির মজাদার চাষ পদ্ধতি হচ্ছে–

- ❖ একটি গাছের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ মাটি ব্যবহার করতে হয় (টবের মতো)
- ❖ পুরো বাগানকে স্বচ্ছ ছাউনি বা অফসেড দিয়ে ঢেকে রাখতে হয়
- ❖ মুকুলগুলো মৌমাছি দিয়ে পরাগায়ন হয়ে থাকে
- ❖ একটি মুকুলে মাত্র একটি আম রেখে বাকি আমগুলো ছাঁটাই করে দিতে হয়
- ❖ আম পরিপক্ক হলে প্রতিটি আমকে উপরের ছাউনির সাথে বেঁধে দিতে হয়
- ❖ একটি নেট ব্যাগের মধ্যে আমটি আলতোভাবে ঝুলিয়ে রাখতে হয়। যাতে আমটি পাকলে মাটিতে না পড়ে অক্ষত অবস্থায় ঝুলন্ত নেট ব্যাগের মধ্যে পড়ে।
- ❖ আমটি প্রাকৃতিকভাবে একা একা পাকে ■

লেখক: প্রাবন্ধিক

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

নিবন্ধ

হলুদ পদ্ম এখন গোমতী

মেজবাউল হক

বন্ধুরা, মনে আছে কি হলুদ পদ্মের কথা। যে ফুল কুমিল্লার বুড়িচংয়ের দক্ষিণ গ্রামের একটি বিলকে করছে হলুদময়। যার ফুটন্ত সৌরভ ছড়িয়ে পড়েছে দেশ ও দেশের বাইরে। অনেক ফুলপ্রেমী নানা জায়গা থেকে ছুটে এসেছে হলুদ পদ্ম দেখতে। পদ্মের মতো দেখতে হলুদ এই পদ্ম দেখে বিস্মিত হন গবেষকরাও। মিল খুঁজে পায়নি অন্য কোনো ফুলের সঙ্গে। তাই এই ফুলের নিজস্ব নামও দিতে পারেনি। তবে আদর করে রঙের নামেই সবাই তাকে ডাকতে শুরু করে 'হলুদ পদ্ম' বলে। অনেক গবেষণার পর সেই প্রিয় পদ্ম ফুল পেল নিজের পরিচয়। যার নাম দেওয়া হয়েছে 'গোমতী'। গোমতী নদীর জলাভূমিতে জন্ম বলেই এর নাম দেওয়া হয়েছে গোমতী। এশীয় পদ্মের বৈজ্ঞানিক নাম Nelumbo Nucifera। এই হলুদ পদ্মের বৈজ্ঞানিক নামের সঙ্গে 'Gomoti, Bangladesh' শব্দ দু'টি যুক্ত হয়েছে।

হলুদ প্রজাতির নতুন এই পদ্ম প্রকরণটিকে গবেষণা করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগের একদল গবেষক। এটিকে নিয়ে একটি গবেষণা প্রতিবেদনও প্রকাশিত হয়েছে বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব প্ল্যান্ট ট্যাক্সোনমরি সাময়িকীতে। গবেষণায় বলা হয়, বুড়িচংয়ের এই পদ্ম ফুলটি হলুদ পদ্মের একটি স্বতন্ত্র প্রকরণ। প্রকৃতিগতভাবেই এর প্রকরণটি তৈরি হয়েছে। এটি দেখতে এশীয় পদ্মের মতো দেখা গেলেও গঠনগত রয়েছে কিছু পার্থক্য। এছাড়া আমেরিকান হলুদ পদ্মের সঙ্গেও এর কোনো মিল নেই। স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের কারণেই এটিকে এশীয় পদ্মের প্রকরণ বলা হয়েছে যা বাংলাদেশেই প্রথম দেখা গেল। বাংলাদেশ তো বটেই– এশিয়া, অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের কোথাও হলুদ পদ্মের কোনো প্রজাতি নেই। আমেরিকান-এশীয় পদ্মের সঙ্গে মিল না থাকায় কুমিল্লার বুড়িচংয়ের এই হলুদ পদ্ম গবেষকদের আলাদাভাবে নজরে আসে।

গবেষক দলটি বলছেন, কোনো একটি উদ্ভিদের একটি থেকে আরেকটি প্রজাতির ফুল, কাণ্ড, পাতা, পুংকেশর, স্ত্রীকেশর, পরাগরেণুসহ বেশির ভাগ ক্ষেত্রে পার্থক্য থাকে। একটির সঙ্গে আরেকটি মিল অমিলের ধরনের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়, সেটি কি কোনো প্রজাতি, নাকি একটি প্রকরণ? বিজ্ঞানীরা ধানের উদাহরণ দিয়ে বলছেন, যেমন ধান নিজে একটি স্বতন্ত্র প্রজাতি। কিন্তু প্রাকৃতিকভাবে এবং মানুষের গবেষণার মাধ্যমে ধানের হাজার হাজার প্রকরণ তৈরি হয়েছে। একটি প্রকরণ থেকে আরেকটি প্রকরণের পার্থক্য সামান্য; কিছু গাছ, ফল, দানাসহ অন্য সবকিছুই প্রায় একই রকমের। যেমন বাংলাদেশে যে এশীয় পদ্মটি দেখা যায়, তা একটি প্রকরণ, কিন্তু দুটি রঙের হয়ে থাকে। পদ্মের দুটো প্রজাতি ও দুই হাজারের মতো প্রকরণ রয়েছে। ■

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

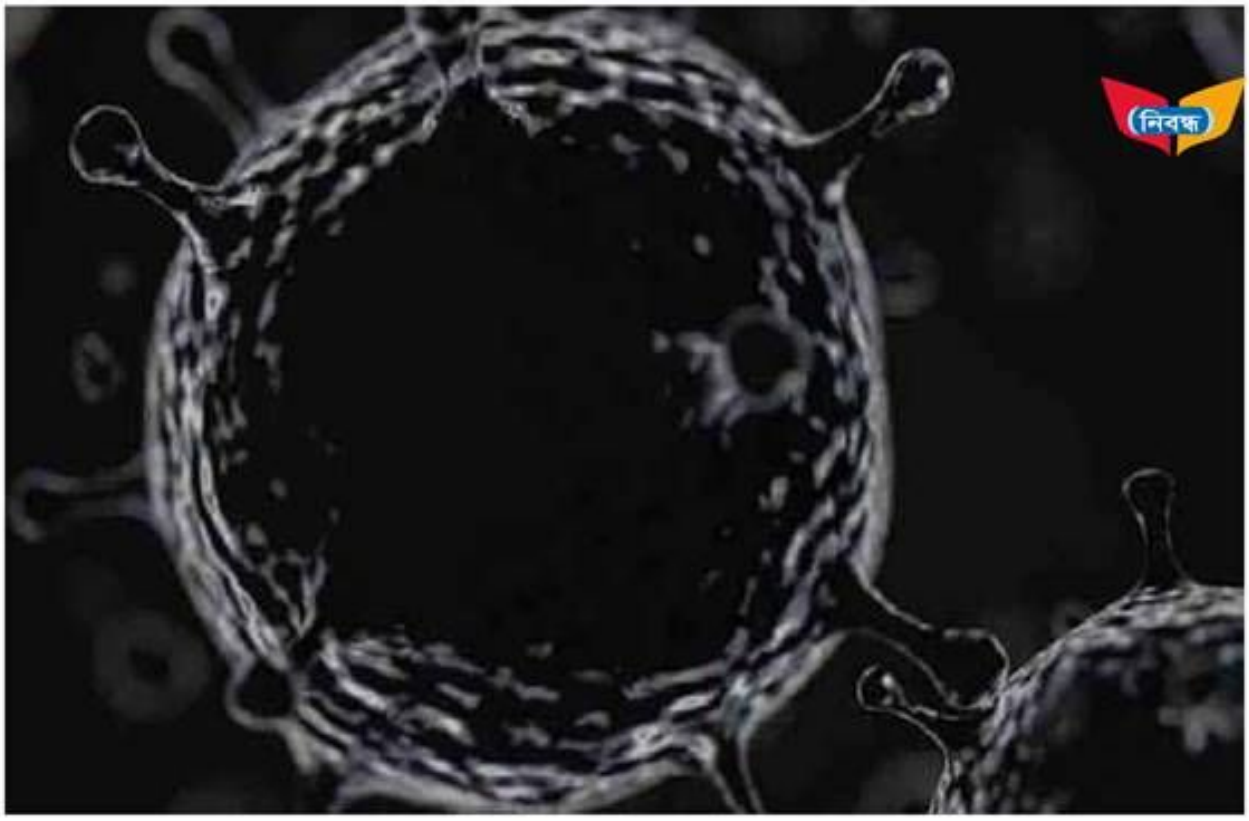

ব্ল্যাক ফাঙ্গাস: আতঙ্ক নয়, সচেতন হবো

মো. জামাল উদ্দিন

মানুষের মধ্যে সাম্প্রতিক সময়ে নতুন উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে ব্ল্যাক ফাঙ্গাসের (মিউকরমাইকোসিস) সংক্রমণ। ভারতের দিল্লিতে ইতোমধ্যেই একে মহামারি ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশেও সংক্রমণ শনাক্ত হয়েছে। তবে ব্ল্যাক ফাঙ্গাস নতুন কিছু নয়। এ রোগ আগেও ছিল।

এই ছত্রাক মাটি, পানি ও বাতাসে ছড়িয়ে থাকলেও সংক্রমণ ক্ষমতা এতই কম যে এক লাখ মানুষের মধ্যে মাত্র এক-দুজনের এই জীবাণু সংক্রমণ হতে পারে। কিন্তু কোনো কারণে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে গেলেই কেবল এই সংক্রমণের মাত্রা বেড়ে যেতে পারে, সুস্থ মানুষের রক্তের শ্বেত রক্ত কণিকা বা নিউট্রোফিল এই ছত্রাকের বিরুদ্ধে মূল প্রতিরক্ষার কাজ করে থাকে। সুতরাং নিউট্রোপেনিয়া বা নিউট্রোফিল কর্মহীনতায় (যেমন ডায়াবেটিস, স্টেরয়েড ব্যবহার) আক্রান্ত ব্যক্তিরা সর্বোচ্চ ঝুঁকিতে থাকেন।

এই ছত্রাক মানুষের শরীরে শ্বাসনালি ও নাকের মধ্য দিয়ে, খাবারের সঙ্গে বা ত্বকের কোনো ক্ষত বা প্রদাহের মধ্য দিয়ে প্রবেশ করে থাকে। আক্রান্ত অংশ আর নাকের শ্লেষ্মা, কফ, চামড়া ও চোখ কালো রং ধারণ করে বলে একে কালো ছত্রাক নামে ডাকা হয়।

ব্ল্যাক ফাঙ্গাস কেন হয়, কাদের হয়

বর্তমানে করোনায় সংক্রমিত রোগীদের মধ্যে এর সংক্রমণ বেশি হতে দেখা যাচ্ছে। এর অন্যতম একটি কারণ রোগীর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাওয়া। এ নিয়ে অযথা আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই। সুস্থ ব্যক্তিদের শরীরে এ সংক্রমণের আশঙ্কা নেই বললেই চলে।

ব্ল্যাক ফাঙ্গাস আমাদের পরিবেশে সব সময়ই থাকে। এমনকি মানুষের শরীরেও থাকে। মিউকর

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

নামের এক ধরনের ছত্রাকের কারণে এই রোগ হয়। সাধারণত আর্দ্র ও উষ্ণ আবহাওয়ায় এর বংশবিস্তার বেশি হয়। এই ছত্রাক পাওয়া যায় মাটি, গাছপালা, সার, পচন ধরা ফল ও সবজিতে। সাধারণত শ্বাসের সময়ে বা শরীরে কাটা অংশের মাধ্যমে এটি মানবদেহে প্রবেশ করে। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অনেক কমে গেলে এটা রোগ হিসেবে দেখা দেয়।

আশার কথা হলো রোগটি ছোঁয়াচে নয়। তবে সংক্রমণ নাক, চোখ, কখনো কখনো মস্তিষ্কেও ছড়ায়। যাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম, শ্বাস প্রশ্বাসের মাধ্যমে তাঁদের শরীরে ব্ল্যাক ফাঙ্গাস প্রবেশ করলে ফুসফুস ও সাইনাস আক্রান্ত হতে পারে। পরে শরীরের অন্য অংশেও ছড়িয়ে পড়ে।

করোনায় সংক্রমিত সংকটাপন্ন রোগীদের জীবন বাঁচাতে ফুসফুসের প্রদাহ কমাতে স্টেরয়েড ব্যবহার করা হয়। এ রোগীদের একটা বড়ো অংশ ডায়াবেটিসে আক্রান্ত বলে বিভিন্ন তথ্য-উপাত্তে জানা গেছে। করোনায় আক্রান্ত ডায়াবেটিস রোগীদের অবস্থা গুরুতর হলে তাদের শরীরে স্টেরয়েড প্রয়োগ করা হয়। এতে রক্তে শর্করার মাত্রা অনেক বেড়ে যায় এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল হয়ে পড়ে। এ পরিস্থিতিতে ব্ল্যাক ফাঙ্গাসে সংক্রমিত হওয়ার ঝুঁকি বেড়ে যায়।

প্রস্রাবে সংক্রমণ, ক্যানডিডিয়াসিস, দাঁতে বা কানে ব্ল্যাক ফাঙ্গাসের সংক্রমণ অনেকেরই হচ্ছে। আশা করি সতর্কতা অবলম্বন করলে এই রোগ থেকে সবাই নিরাপদ থাকতে পারবে। সুতরাং আতঙ্ক নয়, সাবধানতা দরকার। ■

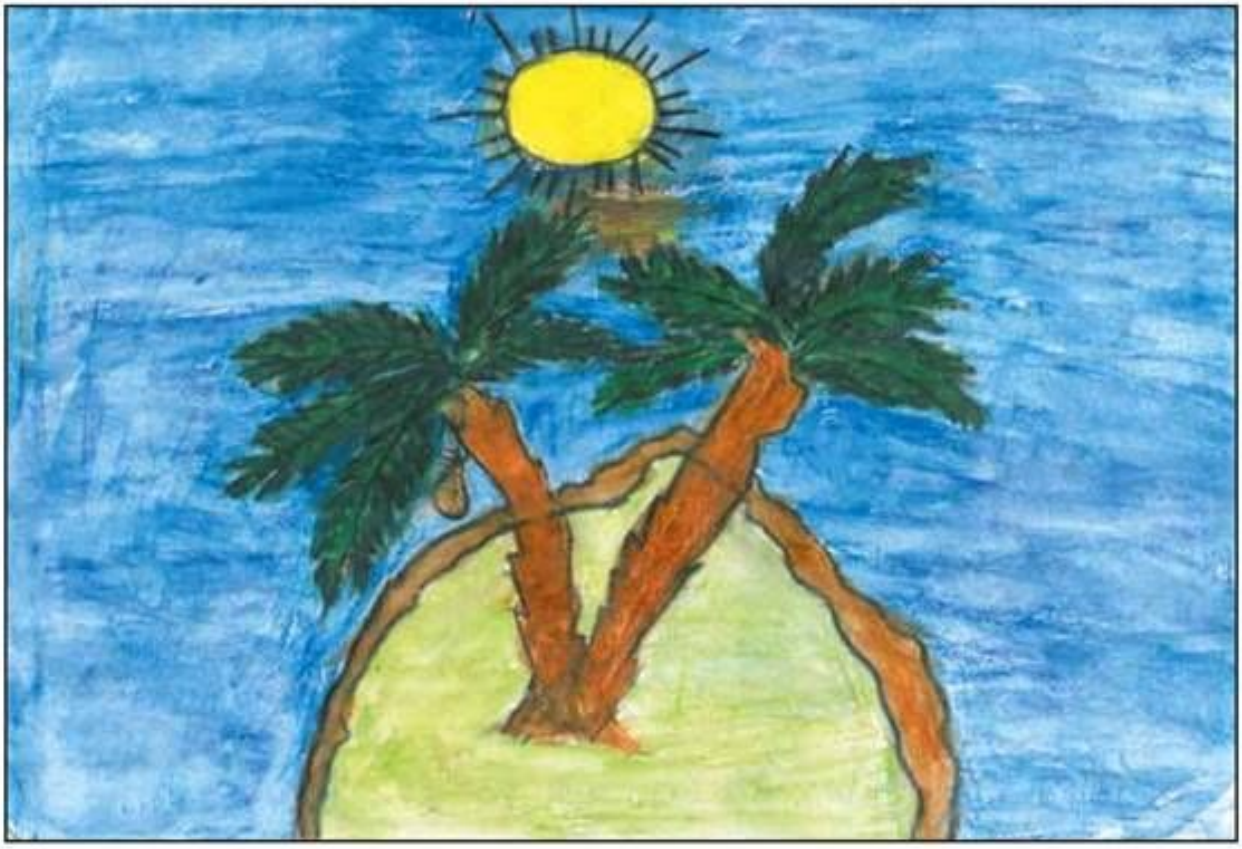

সানজিনা সিদ্দীকি অকি, ৬ষ্ঠ শ্রেণি, পাইকপাড়া স্টাফ কোয়ার্টার স্কুল, ঢাকা

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

প্রথমবারেই বাংলাদেশের সেরা অর্জন

জান্নাতে রোজী

ইউরোপিয়ান গালর্স ম্যাথমেটিক্যাল অলিম্পিয়াড (ইজিএমও) ২০২১-এ প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ অংশগ্রহণ করেই জিতে নিয়েছে রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ পদক। ১৫ নম্বর নিয়ে রৌপ্যপদক পেয়েছে নুজহাত আহমেদ আর ৮ নম্বর নিয়ে ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছে রাইয়ান বিনতে মোস্তফা। করোনা ভাইরাসের কারণে ৯ থেকে ১৫ই এপ্রিল ভার্চুয়ালি আয়োজিত হয়েছে এবারের ইজিএমও। ১১ ও ১২ই এপ্রিল পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। ১৪ই এপ্রিল ফলাফল প্রকাশিত হয়।

ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজের দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী নুজহাত আহমেদ ২০১৬ সালে প্রথম গণিত অলিম্পিয়াড ক্যাম্পে থাকার সুযোগ পায়। তারপর ২০১৮ ও ২০১৯ সালেও সুযোগ হয়। সে সুবাদেই এবারের ইজিএমওতে অংশগ্রহণ করা।

নাটোর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়-এর মাধ্যমিক পরিক্ষার্থী রাইয়ান বিনতে মোস্তফা ২০১৪ সালে আঞ্চলিক গণিত অলিম্পিয়াডে অংশ নেয়। ২০১৯ সালে প্রথমবার জাতীয় ক্যাম্পে থাকার সুযোগ হয়। আর এবার অনলাইন বাছাইয়ের ইজিএমও সুযোগ পেয়ে যায় রাইয়ান। উল্লেখ্য, ইউরোপিয়ান গার্লস ম্যাথমেটিক্যাল অলিম্পিয়াড মেয়েদের জন্য বিশ্বের সবচেয়ে বড়ো গণিত অলিম্পিয়াড।

১০৫ মিনিটে ৩৬টি বই পড়ার রেকর্ড

ভারতীয় বংশোদ্ভূত কিয়ারা কাউর লন্ডনের ওয়ার্ল্ড বুক অব রেকর্ডস ও এশিয়া বুক অব রেকর্ডসে বই পড়ে জায়গা করে নিয়েছে। সম্প্রতি ভারতের সংবাদ মাধ্যমে এনডিটিভির এক প্রতিবেদনে এ স্বীকৃতির কথা হয়েছে। লন্ডনের ওয়ার্ল্ড বুক অব রেকর্ডস কিয়ারাকে 'শিশু বিস্ময়' হিসেবে অভিহিত করেছে। তাকে দেওয়া সনদে প্রতিষ্ঠানটি বলেছে, চার বছর বয়সি শিশু কিয়ারা গত ১৩ই ফেব্রুয়ারি টানা ৩৬টি বই পড়েছে মাত্র ১০৫ মিনিটে। জন্মসূত্রে কিয়ারা যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক। কিন্তু বাবা-মা'র সঙ্গে বর্তমানে থাকে সংযুক্ত আরব আমিরাতে। আবুধাবির একটি

নার্সারি স্কুলে পড়ে সে। তার অধিকাংশ সময় কাটে বই পড়ে। গত এক বছরে কিয়ারা প্রায় ২০০টি বই পড়ে ফেলেছে। সে গাড়িতে বসে বই পড়ে। বিশ্রাম কক্ষে বসে বই পড়ে। স্কুলের লাইব্রেরিতে বসে বই পড়ে। এমনকি ঘুমানোর আগেও সে বই পড়ে।

কী নবারুণের বন্ধুরা, আমরা পারি না টিভি দেখা কমিয়ে দিয়ে, মোবাইল ঘাঁটাঘাঁটি না করে এমন করে বই পড়তে। চলো বন্ধুরা আজ থেকে মোবাইলে গেম না খেলে আমাদের পরম বন্ধু বইকে কাছে টেনে নেই। ■

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

দশদিগন্ত | সাদিয়া ইফফাত আঁখি

কমবয়সি বাংলাদেশি অধ্যাপক

ক্ষুদ্রকে কখনো করো না অবহেলা, একদিন এই ক্ষুদ্রই করবে বিশ্ব জয়। ঠিক এমনটাই করেছিল দুই বছর বয়সি ছোট্ট শিশু সুবর্ণ। যাকে এখন সবাই চেনে আইজ্যাক সুবর্ণ বারী নামে। এখন সুবর্ণের বয়স ৯ বছর। বাঘা বাঘা অঙ্ক নিমিষেই সমাধান করে অদ্ভুত এই বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত শিশু সুবর্ণ। সুবর্ণ যুক্তরাষ্ট্রে 'বিস্ময় বালক' হিসেবে খ্যাতি পেয়েছে। রসায়নের 'পিরিওডিক টেবল' অর্থাৎ পর্যায় সারণি পড়তে গিয়ে যেখানে অনেকেই হয়ত হোঁচট খেয়েছে, সেখানে মাত্র আড়াই বছর বয়সেই তা মুখস্থ বলে দিতে পারত সুবর্ণ। ২০১২ সালের ৯ই এপ্রিল নিউইয়র্কে জন্ম সুবর্ণের। তার বাবার নাম রাশিদুল বারি। মাত্র তিন বছর বয়সেই ভয়েস অব আমেরিকায় সাক্ষাৎকার দেয় এই শিশুটি। ছোটো থেকে সবাইকে অবাক করে একের পর এক কৃতিত্ব দেখিয়েছে সুবর্ণ। দেড় বছর বয়স থেকেই সংখ্যা এবং অঙ্কের প্রতি আগ্রহ ছিল তার। পিএইচডি স্তরের গণিত, পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়নের সমস্যাগুলো সমাধান করতে সক্ষম হওয়ায় খুব অল্প বয়সেই বিশ্বে তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। গণিত, পদার্থবিজ্ঞান, সন্ত্রাসবিরোধী ক্যাম্পেইন ও নিজের লেখা 'দ্য লাভ' গ্রন্থের মাধ্যমে বিশ্বজুড়ে চাইল্ড প্রডিজি হিসেবে পরিচিত সে। এছাড়া হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় তাকে একজন অধ্যাপক হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্যের গভর্নর অ্যান্ড্র কুমো বিশ্বের সবচেয়ে কম বয়সি এ অধ্যাপককে বিশেষ সম্মাননা জানিয়েছেন।

গিনেস বুকে বিশেষ শিশু সানা

বয়স মাত্র ১১, এরই মধ্যে ক্যালকুলেটর ছাড়া মনে মনে করে ফেলল ১২ ডিজিটের গুণ! এও কি সম্ভব? হ্যাঁ বন্ধুরা, যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডার এ প্রতিভাধরের নাম সানা হিরেমাথ। ২ বছর বয়সে ছোট্ট সানার অটিজম ধরা পড়ে। ভারতীয় বংশোদ্ভূত সানার মা প্রিয়া হিরেমাথ যখন তাকে বাসায় পড়ানো শুরু করেন তখন থেকেই বুঝতে পারেন মেয়ের অঙ্কের প্রতি অন্যরকম ভালোবাসা আছে। সানার বাবা জানায়, সানার হাতের স্নায়ুতে সমস্যার জন্য স্কুলে ভর্তি পরীক্ষায় অঙ্কে ফেল করেছিল সানা। কারণ সে পেনসিল ঠিকমতো ধরতে পারেনি। তারপর স্কুলে ধীরে ধীরে তার প্রতিভা ফুটে উঠতে শুরু করে। তখন সানার অঙ্কের মেধা দেখে তার বাবা-মা ঠিক করেন মেয়েকে গিনেসের খাতায় নাম লেখাতে হবে। সানা মনে মনে ১২ ডিজিটের দুটো সংখ্যার গুণ করতে সময় নিয়েছে মাত্র ১০ মিনিট। এ সময় তার চোখ বাঁধা ছিল। হাতে ছিল না কোনো কাগজ- কলমও। আর তাতেই মনে মনে সবচেয়ে বড়ো অঙ্কের গুণ করার জন্য রেকর্ডের খাতায় নাম উঠল সানার।

ইঁদুর যাচ্ছে অবসরে

বন্ধুরা, তোমাদের কি মনে আছে, ইঁদুর মাগাওয়ার কথা। যে কিনা স্বর্ণপদক জিতেছিল। হ্যাঁ বন্ধুরা, সেই ছোট্ট সাহসী স্থলমাইন খোঁজার ইঁদুরটি ৫ বছরের স্বর্ণোজ্জ্বল ক্যারিয়ারের ইতি টানল। মাগাওয়া ইঁদুরটির মূল আবাস আফ্রিকায় হলেও তার কর্মস্থল ছিল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশ কম্বোডিয়ায়। কর্মজীবনে সে উদ্ধার করে প্রায় একশ মাইন ও অবিস্ফোরিত বোমা। ইঁদুরটি সুরক্ষিত করেছে গৃহযুদ্ধের ক্ষত বয়ে চলা কম্বোডিয়ার বিস্তীর্ণ এলাকা। যার প্রতিদানে গেল বছর সে অর্জন করেছে বিশেষ স্বর্ণপদক। বোমা শনাক্তে মেটাল ডিটেকটর কিংবা মানুষের চেয়ে দ্রুত কাজ করতে পারে ইঁদুরটি। শরীরের তুলনায় ওজন কম হওয়ায় মাইনের ওপর দিয়ে হেঁটে গেলেও তা বিস্ফোরিত হয় না। বয়স ৭ বছর হলেও এটা তার বার্ধক্যকাল। এ কারণেই তাকে অবসরে পাঠানো হয়েছে। তার জায়গা নিতে সেন্টারে যোগ দিয়েছে একদল নবীন ইঁদুর। বন্ধুরা বলে রাখি, ৭০ এর দশক থেকে কম্বোডিয়ায় গৃহযুদ্ধ শুরু হয়েছিল। তখন কম্বোডিয়া জুড়ে ৬০ লাখের বেশি মাইন পুঁতে রাখা হয়। এসব মাইন শনাক্তের জন্য ৯০-এর দশক থেকেই ব্যবহার করা হচ্ছে প্রশিক্ষিত ইঁদুর।

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

ফারদিন শামস জামান, ৮ম শ্রেণি, রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুল, রাজশাহী

ফারহা হোসেন, ৩য় শ্রেণি, মডার্ন স্কুল, কুমিল্লা

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

Regd. Dha, 143-Monthly Nobarun, Vol-45, No-11, May 2021, Tk-20.00

হোমায়েদ নাসের, শেষ বর্ষ, আইইউটি, গাজীপুর

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

Reduced document with PDF Reducer Free available on www.jsoft.fr

Regd. Dha, 143-Monthly Nobarun, Vol-45, No-11, May 2021, Tk-20.00

হোমায়েদ নাসের, শেষ বর্ষ, আইইউটি, গাজীপুর

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা